দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

চিনের ছদ্ম-সাম্রাজ্যবাদ
বিপন্ন ছোট দেশগুলির
সার্বভৌমত্ব
— পৃঃ ২৩

যাদবপুর দখলে
রাখতে বামপন্থীদের
কুযুক্তি
— পৃঃ ১১

৭০ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা।। ২৩ জুলাই ২০১৮।। ৬ শ্রাবণ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

শরিয়ত আইনের দাবি দেশের সংবিধান ও অখণ্ডতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ

- শরিয়ত আইনের মাধ্যমে ভারতে সমান্তরাল শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চায় মৌলবাদীরা
- শরিয়ত আইনকে সামনে রেখে মহিলাদের কণ্ঠরোধ করতে চায় ধর্মান্ধরা
- পৃথিবীর বহু দেশে শরিয়ত আইন নিষিদ্ধ

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ৬ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২৩ জুলাই - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

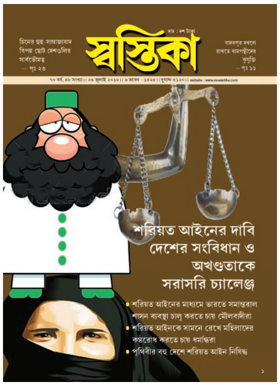

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে দুর্নীতিপরায়ণ সমাজবিরোধীরাই এগিয়ে □ গূঢ়পুরুষ □ ৬

খোলা চিঠি : মুসলমান (পুং) এবং দিদি □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

প্রচলিত দুর্নীতি নিবারক আইনটির দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন □ কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মণ্যম □ ৮

যাদবপুর দখলে রাখতে বামপন্থীদের কুযুক্তি □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১১

শরিয়া আদালত মুসলিম মহিলাদের পায়ে শিকল পরাবার ছল □ সৈয়দ তানভীর নাসরীন □ ১৩

শরিয়ত আদালতের দাবি দেশদ্রোহিতার নামান্তর □ অশোক কুমার চক্রবর্তী □ ১৫

দ্রিঘাংচুর ভুয়োদর্শন : যাদবপুরে ‘হোক অনশন বিপ্লব’ □ ১৭

চীনের ছদ্ম-সাম্রাজ্যবাদ : বিপন্ন ছোট দেশগুলির সার্বভৌমত্ব □ ড. কুণাল ঘোষ □ ২৩

ভারতে খ্রিস্টান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতার প্রকৃত স্বরূপ □ কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় □ ২৬

শ্রীগুরুপূর্ণিমা— উৎসের সন্ধানে অভিযাত্রা □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

গুরু পূর্ণিমা ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন এক পরম্পরা □ প্রবীর মিত্র □ ৩২

গল্প : দু’দিনের দেখা □ রূপশ্রী দত্ত □ ৩৫

দুই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে নারী □ মালিনী চট্টোপাধ্যায় □ ৩৭

বাংলাদেশি হিন্দু না মুসলমান— কাদের আগ্রাসনে অসমিয়া ভাষার সঙ্কট? □ ধর্মানন্দ দেব □ ৪৩

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৪৬-৪৮

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ □ চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □

সুস্বাস্থ্য: ২২ □ এইসময়, সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০ □

নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ □ চিত্রকথা : ৪০ □ খেলা : ৪১□

স্মরণে : ৪৯ □ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩০ জুলাই, '১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

চার্চে শিশুব্যবসা

প্রকাশিত হবে ৩০ জুলাই, '১৮

একদা অভিযোগ উঠেছিল মাদার টেরিজার সেবাকাজ আসলে ধর্মান্তকরণের অছিলা মাত্র। সোজা কথায় পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান না হলে তার সেবা পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, অভিযোগকারীরা দাবি করেছিলেন, সারা ভরতে ছড়ানো মাদারের সেবাকেন্দ্রগুলিতে নাকি শিশুবিক্রি এবং পাচারের মতো ঘটনাও ঘটে। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডে মিলেছে এই অভিযোগের প্রমাণ। শিশু বিক্রির দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন নির্মল মিশন সেবাকেন্দ্রের দুই নান। প্রশ্ন হলো, কতদিন ধরে চলছে এই ব্যবসা? কী উদ্দেশ্যে চলছে? কোথায় যায় এইসব শিশু? মাদারের দেবিত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে কি এর কোনও সম্পর্ক আছে? আগামী সংখ্যা স্বস্তিকা খুঁজবে এইসব প্রশ্নের উত্তর। লিখবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য বিশ্বাস, অমলেশ মিশ্র প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হামিদ আনসারি কি ভারতীয়?

আমাদের দেশের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি শরিয়া আদালত স্থাপনের দাবিকে সমর্থন জানাইয়াছেন। সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (এ আই এম পি এল বি) ইসলামিক শরিয়া আইনকে প্রাসঙ্গিক করিবার লক্ষ্যে ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় শরিয়া আদালত বা দার-উল-কাজা স্থাপনের দাবি তুলিয়াছে। আনসারির বক্তব্য হইল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মুসলমানদের এই নিজস্ব ভাবনাকে সমর্থন করা উচিত। অন্যদিকে ল' বোর্ডের এই প্রস্তাবকে সরাসরি খারিজ করিয়া দিয়াছে কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায় বিচার প্রতিমন্ত্রী পি পি চৌধুরী স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন, সরকার এই ধরনের উদ্যোগের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমাদের সংবিধানে ইহার কোনও স্থান নাই। মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের আদালত গঠনের কোনও ক্ষমতাও নাই। ইহা সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ কাজ। রাজনীতির উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব। ল' বোর্ডের এই প্রস্তাবকে খারিজ করিয়া শিয়া সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডও জানাইয়াছে, এই ধরনের প্রস্তাব রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমান।

প্রশ্ন হইল, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মুসলমানদের জন্য ল' বোর্ড শরিয়া আদালত স্থাপন করিতে চাহিলে দেশে অন্য জনগোষ্ঠীরা কী করিবে? পঞ্জাবে কি শিরোমণি গুরুদ্বার অকাল কমিটি জেলায় জেলায় বিবাদ বিসংবাদ বা অপরাধ বিচার করিবার দায়িত্বগ্রহণ করিবে? অথবা দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে যেখানে খ্রিস্টানরাই অনেক রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে এখন হইতে চার্চ বা ওইরকম কোনও ধর্মীয় সংগঠন আদালতের ভূমিকা গ্রহণ করিবে? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর এখনও পর্যন্ত ল' বোর্ডের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। ল' বোর্ডের আইনি উপদেষ্টা কপিল সিবাল ও তাঁহার দল শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস এই প্রশ্নে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায় নাই। তবে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে রাহুল গান্ধীর সাক্ষাতের পর পরই বিষয়টি লইয়া আলোচনা শুরু হইয়াছে। কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি নাদিম জাভেদ দলের সভাপতি রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস 'মুসলিম পার্টি' মন্তব্যটিকে সমর্থন জানাইয়া বলিয়াছেন, 'আমরা তো মুসলিমদেরই দল'। প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারিও তো আসলে কংগ্রেসেরই লোক। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'কংগ্রেস কি শুধু মুসলিম পুরুষের দল' বলিয়া যে বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা মুসলমান মহিলাদের জন্য একেবারে যথার্থ। কারণ, সেই শাহবানু মামলার সময় হইতে রাজীব গান্ধী ও তাঁহার দল বারবার শুধুই মুসলমান নারীদেরকে বঞ্চনা করিয়াই চলিয়াছে। কিন্তু এইবার ল বোর্ড সরাসরি ভারতীয় সংবিধান এবং আইনি ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছে।

বিজেপি সাংসদ মীনাক্ষি লেখি-র ল' বোর্ডের প্রস্তাবের বিরোধিতা তাই যথার্থ। কেননা ভারত ইসলামি প্রজাতন্ত্র নয়। এখানে ধর্মীয় বিষয় লইয়া আলোচনা চলিতে পারে। কিন্তু আদালত গোটা দেশের ব্যাপার। জেলা, শহর, গ্রাম যাহাই হউক না কেন, এখানে শরিয়া আদালতের কোনও জায়গা নাই।

হামিদ আনসারি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হইয়াও নিজেকে একজন শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘু অর্থাৎ মুসলমান ভাবিয়াছেন, ভারতীয় হইয়া উঠিতে পারেন নাই। আনসারি ও তাঁহার দোসররা ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো দেখিতে চান। ভারতবর্ষের মধ্যেই একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করিতে তাঁহারা ইচ্ছুক। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবনাকে সর্বপ্রকারে প্রতিরোধ করাই আশু কর্তব্য।

সুভাষিতম্

জীবনে যাবদাদানং স্যাৎ প্রদানং ততোধিকম্।

ইত্যেষা প্রার্থনাস্মাকং ভগবন্ পরিপূর্যতাম্।।

জীবনে সমাজ থেকে যা কিছু গ্রহণ করি, তার অধিক যেন সমাজকে দিতে পারি। হে ভগবান, আমাদের এই প্রার্থনা পূরণ কর।

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে দুর্নীতিপরায়ণ সমাজবিরোধীরাই এগিয়ে

গূঢ় পুরুষের কলম

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে ২৫ জুলাই সাধারণ নির্বাচন। অতীতে দেখেছি যে পাকিস্তানে নির্বাচনের অর্থ ভারত বিরোধিতা। সেনা তৎপরতা। এবার পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই ঘোর সঙ্কট। সেখানে আই এস জঙ্গিগোষ্ঠীর আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে ইতিমধ্যেই ১২৮ জন মারা গেছেন। আহত ২০০ জন। অন্যদিকে, বিপুল আর্থিক দুর্নীতির জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ও তাঁর মেয়ে মরিয়ামকে পাক পুলিশ জেলে পুরেছে। রায় ঘোষণার আগেই পিতাপুত্রী পাকিস্তান ছেড়ে লন্ডনে পালান। নির্বাচনে তাঁদের পারিবারিক দল ‘পাকিস্তান মুসলিম লিগ-এন’ প্রার্থীদের জেতাতে তাঁরা পাকিস্তানে ফেরেন। ভরসা দেওয়া হয়েছিল দলের সমর্থকরা জানবাজি রেখে নওয়াজ শরিফ এবং তাঁর কন্যাকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই হয়নি। ভারতের মাটিতে অন্তর্ঘাত চালাতে অভ্যস্থ পাক জঙ্গিরা এখন পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে আই এস জঙ্গিদের হাতে। পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই ইসলামের শত্রু বলে মনে করে আই এস জঙ্গিরা।

আমাদের দেশের বহু লোকের পাক রাজনৈতিক দলগুলির ব্যাপারে তেমন ধারণা নেই। তাই সংক্ষেপে পাকিস্তানের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের পরিচয় জানাই। এবার যে রাজনৈতিক দলটির জয়ের সম্ভাবনা বেশি তার নাম ‘পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি’। প্রয়াত নেত্রী বেনজির ভুট্টোর ছেলে বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির নেতৃত্বের উপর ভরসা রাখছে সমর্থকরা। তবে বিলাওয়ালের সঙ্গে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিশেষ পরিচয় নেই। কারণ, জন্ম ইস্তক তিনি লন্ডনে বড় হয়েছেন। দেশ এবং দেশবাসীর সঙ্গে তাঁর ক্ষীণতম যোগাযোগ নেই। মাতৃভাষাটাও ভাল বলতে পারেন না। তাঁর মা বেনজির ভুট্টোর নামের স্লোগানে তিনি ময়দানে ভেসে আছেন। বুলি একটাই। পাকিস্তান কো বঁচানা হ্যায়। কীভাবে? জানা নেই। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে বলছেন, উন্নয়ন চালু করতে হবে সর্বত্র। কেউ বিশ্বাস করছেন না। তবে আমাদের মমতা দিদির হুকুমে বীরভূমের কেষ্ট মণ্ডল যদি পাকিস্তানে যান তবে বিলাওয়ালের আশা আছে।

পাকিস্তানের দুই নম্বর পার্টি নওয়াজ শরিফের ‘পাকিস্তান মুসলিম লিগ’-এন। নওয়াজকে মুখ করেই ভোটে যাচ্ছে পি এম এল এন। দলের ইস্তেহারে বলা হয়েছে পাক নাগরিকদের স্বাস্থ্যখাতে ২০ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধি করা হবে। কেউ বিশ্বাস করছেন না। কারণ, নওয়াজ শরিফ তাঁর সন্তানদের উন্নয়নের জন্য কয়েক লক্ষ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে পাঠিয়েছেন। বাপের চুরির টাকায় তাঁর তিন পুত্র এবং কন্যা এখন চুটিয়ে ব্যবসা করছে। পাকিস্তানের শীর্ষ আদালতের রায়ে দশ বছর জেল হওয়ার পর নওয়াজ সপরিবারে দেশের বাইরে পালাবার পর একান্ত বাধ্য হয়েই পাকিস্তানে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, ভোট বড় বালাই। তিনিই নেতা, তিনিই মন্ত্রী। সঙ্গে এসেছেন কন্যা মরিয়াম। সরকারি টাকা চুরির দায়ে তাঁরও সাত বছর জেল হয়েছে। গত ১৩ জুলাই বাবার সঙ্গে দেশে ফিরতেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁদের আশা পাকিস্তান জুড়ে এমন হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু করবে যে তাঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হবে পাক প্রশাসন। কিন্তু কোথাও প্রতিবাদের টুঁ শব্দ শোনা যায় না। উল্টে, নওয়াজের দলের প্রথম সারির ১৫০ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। ২৫ জুলাই পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন। তার আগে নেতাদের জামিনের সম্ভাবনা নেই। তবে এটাই নির্বাচনে নওয়াজের তুরুপের তাস। তিনি দেশবাসীকে দেখাতে চাইছেন যে নির্দোষ বলেই পিতা-পুত্রী নির্বাচনের সময় দেশে ফিরেছেন।

নওয়াজ শরিফ ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৯০ সালে পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯৩ সালে আর্থিক দুর্নীতির দায়ে তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব যায়। এর চার বছর পরে ১৯৯৭ সালে আবার প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯৯ সালে সামরিক জুন্টা নওয়াজকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এরপরেই দুর্নীতির দায়ে যাবজ্জীবন জেল হয় তাঁর। তিনি সৌদি আরবে সপরিবারে স্বেচ্ছা নির্বাসন নেন। ২০০৭-এ আবার পাকিস্তানে ফেরেন। এরপর ২০১৩ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত পাক প্রধানমন্ত্রী। আবার লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে সন্তানদের কাছে পাচার করার জন্য পাক সুপ্রিম কোর্ট শরিফের প্রধানমন্ত্রীত্ব খারিজ করে দেয়। রাজনীতিকের ছদ্মবেশে তিনি একজন পেশাদার চোর বলে পাক সুপ্রিম কোর্ট নওয়াজ শরিফের কোনওরকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। তারপরেও তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বায়না ধরেছেন। সম্ভবত পাকিস্তান বলেই এটা সম্ভব।

পাকিস্তানের তিন নম্বর বড় রাজনৈতিক দল হচ্ছে প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহেরিক-ই-ইনসাফি (পিটিআই)। দলের কোনও উন্নয়ন-টুন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নেই। সমর্থকদের প্রচার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ‘অব সির্ফ ইমরান খান, বলয় পে নিশান।’ কিন্তু সমস্যা হয়েছে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী রেহাম খানের লেখা বইকে কেন্দ্র করে। রেহাম খান দাবি করেছেন যে ইমরান অসংখ্য মহিলার সঙ্গে সহবাস করে সারা বিশ্বে অগুন্তি জারজ সন্তান ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রকাশিত বইটির বিরুদ্ধে ইমরান কিন্তু মানহানির মামলাও করেননি। এরপরেও পাকিস্তানের প্রধানন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। যাঁর কাছে নারী শুধুই ভোগের বস্তু। আমরা পাকিস্তানের প্রতিবেশী দেশ। চোর, নারী ধর্ষকরা যদি সেখানের প্রধানমন্ত্রী হয় তার ফল ভারতবাসীকেও ভুগতে হবে। ■

মুসলমান (পুং) এবং দিদি

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

"কংগ্রেস কি শুধু মুসলমান পুরুষদের দল?" আমি নয়, এই প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। প্রশ্ন শুনে ক্ষেপেছে কংগ্রেস। চুপ তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ, দিদি নিজেও জানেন তাঁর লক্ষ্য— মুসলমান (পুং) ভোট।

২২ আগস্ট, ২০১৭। ঐতিহাসিক রায়ে তিন তালাক নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট। এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেয় সর্বোচ্চ আদালত। নরেন্দ্র মোদী সরকার চেয়েছিল গত শীতকালীন অধিবেশনেই তিন তালাক বিল পাশ করিয়ে নিতে। কিন্তু সম্ভব হয়নি।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে রাজ্যসভায় আটকে যায়ই বিল। বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবিতে সরব হয় কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। আর সেই বিরোধিতার স্বরে কংগ্রেসের সঙ্গে সমান তালে গলা মেলায় তৃণমূল কংগ্রেস।

কদিন আগে উত্তরপ্রদেশে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি প্রশ্ন করতে চাই, দলটা কি শুধু মুসলমান পুরুষদের জন্য নাকি মহিলাদেরও ভাল চায়?"

এমন অভিযোগ তো এই রাজ্যের জন্য আরও স্পষ্ট। সুপ্রিম কোর্ট 'তিন তালাক' নিষিদ্ধ করার পরে দেশে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস থেকেই উলটো সুর শোনা গিয়েছিল। তিন তালাক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ই 'অসাংবিধানিক' বলে মন্তব্য করেছিলেন মমতা মন্ত্রিসভার গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। এমন রায় দেওয়ার অধিকার সুপ্রিম কোর্টের নেই বলে দাবি করে মমতার মন্ত্রী বলেন, "রায় যাই হোক এটা আইন নয়। তাই তালাক আটকানো যাবে না। মুসলমান সমাজে তালাক দেওয়া চলছে, চলবে।"

এ তো রায় ঘোষণার পরে। সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলার সময়েই রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী সংখ্যালঘু সংগঠনের সভায় গিয়ে তিন তালাককে সমর্থন জানিয়ে আসেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব তথা রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, "আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে থাকবেন কি না, তা আমাকেই ঠিক করতে দিন। এর বিচার করার জন্য সংবিধান আর উপরওয়ালা আছে।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য রায় ঘোষণার আগে ও পরে মুখই খোলেননি। অনেকটা পরে খোলেন মুখ। ২২ আগস্ট, ২০১৭ রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে প্রথম প্রকাশ্য মন্তব্য করেন ২০১৮ সালের ৩ জানুয়ারি। বীরভূমে এক সভায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তিন তালাক বাতিল করা নিয়ে আমরা বিরোধিতা করিনি। কারণ, এটি মেয়েদের পক্ষে। কিন্তু যে বিল সরকার এনেছে তাতে মেয়েরা আরও বিপদে পড়ে যাবে।"

বিজেপিকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "চুলকে ঘা করার চেষ্টা হচ্ছে। এই বিল নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। রাজনৈতিক কারণেই এই বিল এনেছে। বিলটিই ত্রুটিপূর্ণ।"

তিন তালাক নিয়ে কড়া আইন চাইছে বিজেপি। মোদী সরকার যে বিল পেশ করেছে তাতে তিন তালাক দিলেই স্বামীকে গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ। সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে তিন বছরের জেল। এখানেই মূল বিরোধিতা বিরোধীদের। বিয়ের মতো বিষয়কে সরকারি ফৌজদারি আইনে আনা নিয়েই আপত্তি। তালাক দেওয়া স্বামী জেলে চলে গেলে মহিলারা আরও নাকি অসহায় হয়ে পড়বেন বলে মনে করছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস। মানে অত্যাচারি স্বামীকে মেনে নেওয়াই উচিত! আচ্ছা, মমতা দিদি কি ভেবে দেখেছেন যে স্বামী তালাক দিয়েছে সে জেলে না, অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে তাতে তালাকপ্রাপ্ত অসহায় মহিলার কী আসে যায়?

আসলে দিদির অঙ্ক অন্য। এখনও মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশে ধর্মান্ধতা অনেক বেশি। সেখানে ধর্মীয় বিধান আইনের শাসনের থেকে বড়। তাছাড়া স্বামীর কথা মতো ভোট দেওয়ার রেওয়াজও রয়েছে। তাই পুংদের খুশি রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে হবে বলে ধারণা দিদি ও তাঁর ভাইদের।

কিন্তু সেই অঙ্ক কি মিলবে! উত্তরপ্রদেশে কিন্তু মেলেনি।

—সুন্দর মৌলিক

প্রচলিত দুর্নীতি নিবারক আইনটির দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন

অতিথি কলম

কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মণ্যম

ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে একটি অবশ্য মান্য নীতি হচ্ছে হাজারজন অপরাধীও যদি বেবাক ছাড়া পেয়ে যায় যাক, কিন্তু একজন নিরপরাধীও যেন ভুল করে শাস্তি না পায়। অতি সম্প্রতি ব্যাঙ্কের বিভিন্ন পদাধিকারীদের নাগাড়ে ধরপাকড় ও চার্জশিট দেওয়ার যে হিড়িক পড়েছে তাতে কিন্তু ওই ন্যায় বিচারের মূল নীতিটিই অবহেলিত হচ্ছে। ব্যাঙ্ক আধিকারিক বা অন্য উচ্চ পদাধিকারী যাঁরা বহু বছরের একনিষ্ঠ ও আন্তরিক চেষ্টায় কর্মক্ষেত্রে তিল তিল করে গড়ে তোলা সুনাম তৈরি করেছেন গ্রেপ্তার, চার্জশিট ও তৎপরবর্তী আদালতের সম্ভাব্য দীর্ঘকালীন বিচার প্রক্রিয়ার অভিঘাতে এ সবই কলঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত অপরাধীদের পাশাপাশি দীর্ঘদিন অবসর গ্রহণ করা বহু আধিকারিকের বিরুদ্ধে যেহেতু নির্বিচারে মামলা ঠুকে দেওয়া হচ্ছে তাতে অবসর পরবর্তী জীবনের প্রকৃত অবস্থা নিয়ে চিন্তায় অনেকেরই ঘুম উড়ে যাচ্ছে। আদালত ও সেখানকার নিয়ম কানুন ও জটিলতা কাটিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে আকাশ পাতাল ছুটোছুটি করে নাকানি চোবানি খাবার পরিস্থিতি ঘনায়মান।

আজকে যেভাবে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে তার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এখানে মুড়ি মিছরির এক দর হয়ে যাচ্ছে। সত্যি সত্যিই যে ব্যক্তি দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন আর যিনি সংস্থার স্বার্থেই সৎভাবে কিছুটা প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে ঋণদান ও সেই সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কোনও ফারাক করা হচ্ছে না। এর ফলে যারা নিয়মের ঘেরাটোপের মধ্যেই 'ছুপা রুস্তম' হয়ে গোপন জালিয়াতি করেছিল তারা আজ মজায় আছে, অথচ সে অর্থে নিরপরাধীরাই সাজার মুখে পড়ছে। এমন বিষম পরিস্থিতি বা অন্যায় কাজকর্ম থেকে পরিত্রাণ পেতে সংসদের আসন্ন অধিবেশনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রস্তাবিত Prevention of Corruption Act (PCA) বিলটিকে অনুমোদন করা দরকার। এই সূত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কী নিয়ম চলছে তার দিকে একটু নজর ফেরালে আমেরিকা, যেটি সর্বাপেক্ষা মামলা জর্জরিত দেশ বলে খ্যাত তার কথা বলা যেতে পারে।

আমেরিকায় দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রেও যেখানে ফৌজদারি মামলার তুলনায় প্রমাণ দাখিল করার বাধ্যবাধ্যকতা একটু কম সেখানেও 'Business Judgement Rule' — অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের ভালোর জন্য সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল কিনা' এই আপ্তবাক্যের ভিত্তিতেই আদালত তার বিচার প্রক্রিয়া চালায়। এই নিয়মকে ব্যাখ্যা করলে বোঝায় বরাবর প্রচলিত থাকা একটি দৃঢ় ধারণা যে আধিকারিক ও কর্তারা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন তার হিতার্থেই তাঁদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর এই প্রচলিত ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত ধারণা যা প্রায় রীতিতেই রূপান্তরিত হয়ে গেছে তার ওপর আদালত তার নিজস্ব কোনও মতামত দিয়ে অনধিকার চর্চা করবে না। ব্যবসার কারণে নেওয়া সিদ্ধান্তকে সদা আদালতের বিচারাধীন করলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটিই স্তব্ধ হয়ে যাবে। দীর্ঘদিন আগে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নেওয়া অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি বেঠিক বলে মনে হয় অর্থাৎ যার ফলে ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণ গ্রহীতার কাজ বারবার অর্থনৈতিক ভাবে ব্যর্থ হয় তার পরিণতিতে আদালতের নাক গলানোর কোনও প্রয়োজন হয় না।

এই নিয়মটিতে তিন ধরনের বিষয়কে মাথায় রাখা হয়। (১) সেখানে পরিস্কার দুর্নীতির কোনও চিহ্ন রয়েছে কিনা, (২) সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বড় বড় কোনও গাফিলতি আছে কিনা, (৩) সিদ্ধান্তের ফলে তাঁর কোনও ব্যক্তিগত উপকার বা অর্থাগম হলো কিনা।

সেখানকার আদালত আরও একটু এগিয়ে বলেছে যদি অতীতে নেওয়া কোনও ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে আশানুরূপ সাফল্য না পায় কিন্তু যদি তা ব্যক্তি স্বার্থের খাতিরেই নেওয়া হয়ে থাকে তবেই তার বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও গাফিলতির প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ করা জরুরি। পরিস্কার বলা হচ্ছে সৎভাবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে যদি ভুল, ত্রুটি থেকে যায়, ব্যাঙ্কের অধিকর্তা বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সেক্ষেত্রে তার কর্তব্য কর্মে অবহেলার দায়ে কখনই অভিযুক্ত করা যাবে না।

ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে গেলে যে ধরনের প্রমাণের উপস্থাপনা দরকার তা আরও কড়া। এক্ষেত্রে প্রধান যে প্রমাণ দাখিল করতে হবে তা হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা কেবলমাত্র নিজ স্বার্থ তা অর্থনৈতিক বা অন্য কিছু যাই হোক না কেন চরিতার্থ করার জন্যই তাদের সিদ্ধান্ত পরিচালিত করেছিল। এক্ষেত্রে তারা যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছে তার প্রতি কোনও আনুগত্য তারা দেখায়নি। অর্থাৎ সে তার পদের মর্যাদা অনুযায়ী কাজ করেনি এই মর্মে প্রমাণ দেওয়া জরুরি।

এই সূত্রে দুর্নীতি নিবারক আইনে (পিসিএ) পরিবর্তন এমনভাবে আনতে হবে যাতে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই যে কাজটি হয়েছে সেই সংক্রান্ত প্রমাণগুলিই আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য হওয়ার মর্যাদা পায়। তাই ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির কোনও প্রাথমিক প্রমাণ যদি না থাকে সেক্ষেত্রে এফ আই আর ও চার্জশিট দুমদাম দাখিল করা যাবে না। বর্তমানে যে পদ্ধতি জারি

আছে সেই অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার ওপর (ধরুন ১০ কোটি) যে সমস্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা টাকা শোধ করেনি তাদের একধার থেকে নিরীক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। এই ধরনের ঋণ খোলাপি অ্যাকাউন্টগুলিতে যাঁরা ঋণ দিয়েছিলেন পদ্ধতিগত কোনও ভুল চুক যদি নিরীক্ষণে ধরা পড়ে তাহলেই তাঁদের বিরুদ্ধে vigilance enforcement action শুরু হয়ে যাবে। সেখানে ওই ঋণ দিয়ে ঋণদাতার নিজস্ব কোনও লাভ হয়েছিল কিনা তা ধর্তব্যের মধ্যেই আসবে না।

কিন্তু এই ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধির বিষয়টিই একেবারে বাধ্যতামূলকভাবে পরিধির মধ্যে প্রথমেই আনা দরকার। কেননা অন্যান্য পেশায় যা দরকার পড়ে না ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগোছালো ও টুকরো তথ্যের ভিত্তিতেই অধিকাংশ সময় সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যা প্রাথমিকভাবে কখনই যাকে বলে অবজেক্টিভ তো নয়ই বরং ধ্যান-ধারণা, সুনাম-দুর্নাম নির্ভর। যেমন কোনও ঋণ গ্রহীতার চরিত্র কেমন, তার অর্থনৈতিক সততা কতটা প্রমাণিত এগুলি এতটাই আপেক্ষিক যা এক ম্যানেজারের থেকে আর এক ম্যনেজারের নেওয়া সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই প্রাধান্য বদলে যেতে পারে।

একইভাবে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যতে কাজ কারবার চালিয়ে উন্নতি করার সম্ভাব্য প্রবণতা কতটা তার নির্ধারণও পুরোপুরি আপেক্ষিক। এক ম্যানেজার বা কিছু অধিকর্তার কাছে তা যুক্তিসঙ্গত ও অর্থনৈতিকভাবে মান্য হলেও অন্য কয়েকজনের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

শুধু তাই নয়, এই ধরনের মূল্যায়ন একটা সময় একেবারে সঠিক ও অর্থনীতিগ্রাহ্য মনে হওয়ার কারণে ঋণ দেওয়া হলেও পরে খারাপ প্রমাণিত হলে 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে'র মতো আগের সিদ্ধান্তগুলিকে বেমালুম কোনও উদ্দেশ্যে নেওয়া বেঠিক বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। নিয়মমাফিক পদ্ধতি মেনেও যদি কোনও ঋণগ্রহীতার ঋণকে আবার নবীকরণ করা হয়, কিন্তু পরে যদি তদন্তকারী দল এসে সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে শুধু এই কারণে যে সেই ব্যক্তি টাকা শোধ না করে বিদেশে ফেরার হয়ে গেছে। বিষয়টা সঠিক হবে না। এই ধরনের কেস যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা দাবি করে। অযৌক্তিক তড়িঘড়ি আসামি বানানো তো নয়ই বরং যার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে ঋণদাতার ব্যক্তি স্বার্থে অসৎভাবে ঋণ দেওয়ার আগে বলা প্রসঙ্গটি।

এই ধরনের উদাহরণকেই যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণের পরিধির মধ্যে আনতে হবে। প্রথমত ব্যাঙ্কের আধিকারিক সাধারণ অর্থনৈতিক প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে থেকেই তার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথমে কখনই ধরে নেওয়া যাবে না যে সে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আর অসৎ উদ্দেশ্যের কথা তো প্রথমে উঠতেই পারে না। উদাহরণ দিয়ে একটা কথা বলা যেতে পারে, যদি কোনও ব্যক্তি বা সংস্থাকে ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক তার নিকট অতীতের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বা সংস্থার ব্যবসার ইতিবাচক ফলাফলকে (যদি হয়ে থাকে) ভিত্তি করে তার ভবিষ্যতের কারবার পরিচালনার সম্ভাব্য ফলাফল কী হতে পারে তার ইতিবাচক অনুমান করে ঋণ দেয় সেক্ষেত্রে সংস্থা ভবিষ্যৎ ক্ষতির মুখে পড়লে ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির ভিত্তিতে নেওয়ার তকমা দেওয়া যাবে?

তাই, তদন্তকারী সংস্থার হাতে যদি পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকে যাতে করে তারা নিশ্চিত হতে পারে বা প্রমাণ করতে পারে যে ঋণদানের উদ্দেশ্যটি শুরুতেই ছিল অভিসন্ধিমূলক, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধারণার ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার বা চার্জশিট দেওয়ার আগে তাদের নিজেদের পেশাগত দক্ষতাকে নতুন করে নীরিক্ষণের প্রয়োজন আছে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে কিন্তু এটা ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই যে, সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে যে বিপুল পরিমাণ দুর্নীতি রয়েছে তাকে খাটো করে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাস্তবে ব্যাঙ্ক দুর্নীতি এমন পর্যায়ে এসেছে যা সকলেরই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে, সঠিক কারণকে চিহ্নিত করতে গেলে প্রচলিত আইনে পরিবর্তন দরকার যাতে দুর্নীতির মোকাবিলা সঠিকভাবে করা যায়। যাকে সামনে পাওয়া যাবে অর্থাৎ যে সই করেছিল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তাকে ধরলে মহাবিপদ উপস্থিত হবে। কেন সেটা দেখা যাক—

(১) ব্যাঙ্কের ঋণ বিভাগের আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তরা ঋণ দেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত উদাসীন হয়ে পড়বে। এর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিসংখ্যানে আসছে।

(২) ব্যাঙ্কে পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন একটা ধারা তৈরি হবে যে সমস্ত আধিকারিক ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও দুর্নীতির অভিযোগে হাত পোড়ায়নি তারাই কেবল পরবর্তী পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সব থেকে প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড থেকে যারা নিজেকে সন্তর্পণে সরিয়ে রাখতে পারবে তারাই উন্নতির সোপানে উঠবে।

(৩) ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক দক্ষতা ফলদায়ী কিনা যাকে বলা হয় ইকোনোমিক ভাইয়াবিলিটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গুটিকয়েক পূর্ব নির্ধারিত ছকে বাঁধা কেতাবি মানদণ্ডই বিবেচিত হবে। এই সীমার বাইরে যতই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা থাকুক না কেন সেই সংস্থা ঋণের ক্ষেত্রে অযোগ্যই থেকে যাবে।

ক্রেডিট অফিসাররা মৌলিক ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে কোনও সংস্থার credit worthiness বা ঋণ পাবার যোগ্যতা বিচার করে থাকেন। হ্যাঁ, কিছু নির্দিষ্ট মানদণ্ড অবশ্যই থাকে। সেই পরিধি অতিক্রম করা মানেই চুরি করা নয়। সংস্থার স্বার্থে মানদণ্ড অতিক্রম করাটা অর্থনৈতিক অপরাধপ্রবণতা নয়। তাই, এই সূত্রে তদন্ত ও নজরদারির ক্ষেত্রেও উপযুক্ত আইনি মানদণ্ড দরকার যাতে দেশের ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের সংস্কৃতিকে জলাভূমি থেকে পুনরুদ্ধার করা যায়।

(লেখক হায়দরাবাদের ইন্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেসের অধ্যাপক)

রম্যরচনা

ছাত্র ইংরাজি পরীক্ষা দিয়ে আসার পর...

শিক্ষক— (গম্ভীর কণ্ঠে) কী রে পরীক্ষা কেমন দিলি?

ছাত্র—ভালো।

শিক্ষক—কী এসেছিল কোশ্চেন?

ছাত্র—ওই তো, শেক্সপিয়ারের চারটে নাটকের নাম লিখতে বলেছিল, আর সেগুলো কী নিয়ে লেখা, সেইটা বলতে বলেছিল।

শিক্ষক—পারলি?

ছাত্র—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও তো আমার মুখস্ত।

শিক্ষক—(অবাক হয়ে) কী লিখলি?

ছাত্র—(দৃঢ় কণ্ঠে) লিখলাম, শেক্সপিয়ার খুব মামলেট খেতে ভালোবাসত। একবার ডিমের মধ্যে হ্যাম পড়ে গেছিল বলে সেটা হয়ে গেল হ্যামলেট। তাই নিয়ে একটা নাটক।

শিক্ষক—(শুকনো গলায়) বাহ্। আর?

ছাত্র—তারপর একদিন ওর মা রান্নাঘরে দুধ গরম করতে বসিয়ে বাথরুমে গেছিল, বলে গেছিল, বাবা, একটু খেয়াল রাখিস। সেই দুধ উথলে উঠে পুড়ে গেল। তাই নিয়ে লিখল—ওথেলো।

শিক্ষক—(এক গ্লাস জল এক নিঃশ্বাসে খেয়ে) তারপর?

ছাত্র—তারপর একবার ও আর ওর মা ভেনিসে গেছিল, সেখানে গিয়ে ওর মার গলার চেন হারিয়ে গেল। তাই নিয়ে একটা নাটক লিখল—মার চেন অব ভেনিস।

শিক্ষক—(বুকে হাত বোলাতে বোলাতে) আর? চার নম্বর?

ছাত্র—আর একটা কী যেন? কী যেন, কী যেন? ও হ্যাঁ। শেক্সপিয়ারের মেয়ে হয়েছিল জুলাই মাসে সিজার করে, তার নাম দিয়েছিল জুলিয়া। সেই নিয়ে নাটক— জুলিয়াস সিজার।

শিক্ষক চেয়ার থেকে মাটিতে আছড়ে পড়লেন।

উবাচ

“চাঁদ-তারা সংবলিত সবুজ পতাকা ইসলাম বিরোধী। পাকিস্তানের পতাকার সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। পাকিস্তান আমাদের শত্রু দেশ। সেই জন্য এই পতাকা নিষিদ্ধ করা উচিত।”

ওয়াসিম রিজভি
শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান

সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা আবেদনে

“রাহুল গান্ধী ঠিকই বলেছেন। কংগ্রেস তো মুসলমানদেরই দল।”

এক উর্দু দৈনিকে রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের সমর্থনে

নাদিম জাভেদ
কংগ্রেস দলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি

“সব অত্যাচারীর দিনই একদিন ফুরোয়। টিএমসি-র উচিত বাংলার দেওয়াল-লিখন ভালোভাবে পড়া। এখানকার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। আশায় আছেন ত্রিপুরার মতো এখানেও একদিন সত্যিকারের পরিবর্তন ঘটবে।”

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

বাংলায় তৃণমূলের সিন্ডিকেট-রাজ প্রসঙ্গে

“ক্ষমা না চাইলে ওকে (নিদা খান) একঘরে করা হবে। কেউ ওর সঙ্গে মেলামেশা করবে না, একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করবে না— মৃত্যুর পর কেউ কবরেও দেবে না।”

মুফতি আফজল রাজভি
আলা হজরত দরগার প্রধান

নিকাহ্ হালালার বিরুদ্ধে নিদা খানের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে

যাদবপুর দখলে রাখতে বামপন্থীদের কুযুক্তি

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সিপিএমের দোর্দণ্ড প্রতাপের আমলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ কর্ত্রী ছিলেন সিপিএম নেত্রী শ্যামলী গুপ্ত। সেই সময়ে যাদবপুরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কোন কোন বামপন্থী পরিবারের ছেলে-মেয়েরা উত্তীর্ণ হবে— তাও ঠিক করে দিতেন শ্যামলী দেবী। যেমন আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে ঠিক করে দেওয়া হতো কে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবেন। অর্থাৎ উচ্চমাধ্যমিকে নম্বর যাই থাক না কেন, সিপিএম নেত্রীর কৃপা হলে যাদবপুরে পঠনপাঠন পাকা। ওই বাম আমলে যাদবপুরে ভর্তির ফর্ম জমা দেওয়ার লাইনটি নিয়ন্ত্রণ করতেন বামপন্থী দাদা-দিদিরা। এই দাদা-দিদিদের কৃপা লাভ করলে চলার পথ অনেকটাই সহজ হয়ে যেত। তো, সেই আমলে একটি মেধাবী ছাত্রী কোনও রাজনৈতিক মুরুব্বি ছাড়াই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু সুযোগ পেলেও তার জন্য অনেক দুর্ভোগ অপেক্ষা করছিল ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্লাস শুরু হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই তার ওপর ক্রমাগত চাপ আসতে থাকে বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়নে নাম লেখানোর জন্য। মেয়েটি এই চাপের কাছে নতিস্বীকার করেনি। ফলে, শেষ পর্যন্ত আসরে নামেন ওই ইংরেজি বিভাগেরই এক অতি পরিচিত বামপন্থী অধ্যাপিকা। তিনি আকারে-ইঙ্গিতে মেয়েটিকে বোঝাতে থাকেন, বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়নে নাম না লেখালে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যেতে পারে। ক্রমাগত এরকম চাপ ও মানসিক নির্যাতনে মেয়েটি কিছুদিন পরেই হতাশার শিকার হয়ে পড়ে। কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। মেয়েটির পরিবারের লোকজন বিষয়টি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধানকে জানান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগকে আমলই দেননি। বরং, অধ্যাপকরা পাল্টা বলেন, মেয়েটি যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন নয় বলেই তার সমস্যা হচ্ছে। পরে এই মেয়েটি অন্য কলেজে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে বি এ এবং এম এ পাশ করে। বর্তমানে একটি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সে। কিন্তু রাজনৈতিক মুরুব্বির জোরে ওই সময় বামপন্থী পরিবারের যে ‘মেধাবী’ ছেলে-মেয়েরা অন্যদের টপকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়েছিল, মেধার জোরে তারা এখন কে কোথায় প্রতিষ্ঠিত তা কিন্তু আর জানা যায়নি।

> **‘পশ্চিমবাংলার শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অতিবাম রাজনীতি প্রায় বিলুপ্ত হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এর প্রভাব আজও বিদ্যমান। এর পিছনে কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই আসবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা। একথা অনস্বীকার্য যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা বড় অংশ অতি বাম রাজনীতির ধারক এবং বাহক। বিভিন্ন সময়ে সরকারের এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছাত্রদের সঙ্গে এঁদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে।**

এই হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী সম্প্রতি একটি নিবন্ধে লিখেছেন (স্বস্তিকা, ১৬ জুলাই, ২০১৮), ‘১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় এসে মসনদ দখল করে। তখন থেকেই শুরু হয় শিক্ষাক্ষেত্রের মেরুকরণ।... সুচারু রূপে অধ্যাপক সংগঠন এবং কর্মচারী সংগঠনকে নিজের কবজায় আনতে সক্ষম হন বাম নেতারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পদগুলি ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে বিশেষ কিছু আধিকারিকের দখলে যারা বামপন্থী নেতাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ অথবা সরাসরি বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ১৯৮০-র দশক থেকেই শুরু হয় বামনেতা ঘনিষ্ঠ উপাচার্য, সহ উপাচার্য নিয়োগ। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮৫-৮৬ সালের মাঝামাঝি উপাচার্য করে নিয়ে আসা হয় এমন একজন শিক্ষককে (তিনি পরে বামফ্রন্ট সরকারের একজন পূর্ণ মন্ত্রী হয়েছিলেন) যিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম মেরুকরণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে প্রশাসনের সহায়তায় প্রায় সমস্ত অ্যাকাডেমিক বা শিক্ষা সংক্রান্ত শীর্ষপদে ও বহু প্রশাসনিক পদে বামপন্থী নেতাদের পছন্দের মানুষরা বসতে শুরু করেন।’ এখানে এটাও উল্লেখ করা জরুরি যে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ড. সুরঞ্জন দাসও একজন আগমার্কা বামপন্থী। বাম আমলে সিপিএমের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে সুরঞ্জনবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি লাভ করেন। জমানা বদলের পর অবশ্য সুরঞ্জনবাবু বর্তমান শাসকের ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যপদে মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছিল তাঁর। পরে শাসক ঘনিষ্ঠ আমলা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মপত্নী সোনালী চক্রবর্তীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি পাইয়ে দেবার জন্য সুরঞ্জনবাবুকে যাদবপুরের উপাচার্য করা হয়েছে। যাদবপুরে প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কের সময় বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকতে এবং বেরতে দেখা গেছে এই উপাচার্যকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. অচিন্ত্য বিশ্বাসের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী উপস্থিত থাকলেও, আমন্ত্রণ পেয়েও সৌজন্যবশত উপাচার্য সুরঞ্জনবাবু অনুষ্ঠানে আসার

ভদ্রতাটুকুও দেখাননি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তী আরও লিখেছেন, 'পশ্চিমবাংলার শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অতিবাম রাজনীতি প্রায় বিলুপ্ত হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এর প্রভাব আজও বিদ্যমান। এর পিছনে কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই আসবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা। একথা অনস্বীকার্য যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা বড় অংশ অতি বাম রাজনীতির ধারক এবং বাহক। বিভিন্ন সময়ে সরকারের এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছাত্রদের সঙ্গে এঁদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এরপর একসময় পড়া শেষে পাশ করে চলে যায়; কিন্তু শিক্ষকরা থেকে যান। ফলে অতিবাম আন্দোলন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মোটামুটি এক দীর্ঘস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যের এই বক্তব্যটুকু মনোনিবেশ সহকারে বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে— কোন শ্রেণীর ছাত্র এবং শিক্ষকরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগে ছ'টি বিষয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার দাবি তুলে ধুন্ধুমার বাধিয়েছিলেন এবং কার্যত রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছেন প্রবেশিকা পরীক্ষা বহাল রাখার বিষয়টি মেনে নিতে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের এই প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছে। অভিযোগটা মূলত উঠছে এক শ্রেণীর বাম এবং অতিবাম শিক্ষক ও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে। যে ছটি বিষয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে, সেই বিভাগগুলিতে ভর্তির নিয়ম হলো— ভর্তির ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ নম্বর নেওয়া হবে উচ্চমাধ্যমিকের প্রাপ্ত নম্বর বিচার করে আর বাকি ৫০ শতাংশ নেওয়া হবে প্রবেশিকা পরীক্ষা থেকে। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছে যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাম শিক্ষকরা তাদের মনোমত প্রার্থীদের বেশি নম্বর দিয়ে ভর্তি তালিকার উপরের দিকে রাখছেন। ফলে উচ্চমাধ্যমিকে অনেক ভালো নম্বর পেয়েও অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারে না এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। বাম আমলে বহু বামপন্থী নেতা-নেত্রীর পুত্র কন্যারা উচ্চমাধ্যমিকে ওপরের দিকে না থেকেও অনায়াসেই যাদবপুর এবং প্রেসিডেন্সির মতো কলেজে এভাবেই স্থান করে নিয়েছিলেন। বাম শিক্ষকদের কল্যাণে এখনও এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই বামপন্থীদেরই রমরমা।

প্রবেশিকা পরীক্ষা বন্ধ হলে যাদবপুরকে এই বামপন্থী ঘাঁটি বানানোর প্রক্রিয়াটাও বন্ধ হয়ে যাবে। আর তাতেই আপত্তি এই বামপন্থীদের। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার সপক্ষে বামপন্থীরা যে যুক্তি তুলছেন, তার কোনও গ্রহণযোগ্যতা আছে কি? প্রথমত, বামপন্থী ছাত্র-শিক্ষকরা বলছেন— যাদবপুর আর পাঁচটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থেকে আলাদা। এখানে প্রবেশিকার মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিচার হয়ে যাবে। তার অর্থ কি তাহলে এই যে, উচ্চমাধ্যমিকের মেধা তালিকাকে এরা মানেন না? আর যাদবপুরে পঠন-পাঠন না করলেই মেধায় সে পিছিয়ে রইল— এই মাপকাঠি তৈরি করে দিল কে— যাদবপুরের কিছু বাম ও অতি বামপন্থী ছাত্র এবং শিক্ষক? এটা কি অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি চূড়ান্ত তাচ্ছিল্য প্রকাশ এবং অবমাননা নয়? কলাবিভাগের ওই ছটি বিষয়ে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়ে যারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে— তাদের মেধা ও প্রতিভার প্রকাশ আর কোথায় পাওয়া গিয়েছে জানতে পারলে ভালো হতো। নাকি তাদের মেধা ও প্রতিভা শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ থাকছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি বাম রাজনীতির নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে? আর একটি প্রশ্ন— যাদবপুরই মেধা বিচারের সঠিক স্থান—এটাই বা কে ঠিক করল?

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী এবং অতিবামপন্থী শিক্ষকরা বলছেন, এই প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি থেকে শুরু করে মূল্যায়ন সবই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই করবেন। বাইরের কোনও শিক্ষককে এ দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। বাইরের শিক্ষকদের এই দায়িত্ব দিলে নাকি যাদবপুরের মান অনুযায়ী যথাযথ মূল্যায়ন হবে না। এসব কথাবার্তার অর্থ কী? এসব কথাবার্তা বলে বাংলার অবশিষ্ট শিক্ষক সমাজকেই কি অপমানিত করছেন না যাদবপুরের একশ্রেণীর বাম ও অতি বাম শিক্ষকরা? এদের কি ধারণা, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এরাই একমাত্র মেধাসম্পন্ন শিক্ষক? এই ধৃষ্টতা প্রকাশের সাহস এরা পান কোথা থেকে? আসলে বাইরের শিক্ষকদের মূল্যায়নে যে এদের বড়ই ভয়। ভর্তির নামে এতদিন নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন বাড়ানোর যে কাজটি এরা নীরবে চালিয়ে আসছিলেন— বাইরের শিক্ষকদের হাতে ক্ষমতা গেলে তো সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

সবশেষ প্রশ্ন, বামপন্থী শিক্ষকদের দাবি মতো 'মেধাবী' ছেলে-মেয়েরা যাদবপুরের কলাবিভাগে পড়াশোনা বিতর্কের সময় স্লোগান দিয়েছে— 'উপাচার্যের চামড়া, গুটিয়ে দেব আমরা।' এই স্লোগান শুনে বামপন্থী উপাচার্য সুরঞ্জন দাস যারপরনাই ব্যথিত হয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, ব্যথিত উপাচার্য পদত্যাগও করতে চেয়েছেন। এরও আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিপ্লবী ছাত্র-ছাত্রীরা নানা ছুঁতো নাতায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী উপাচার্য থাকাকালীন চূড়ান্ত অবমাননার মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। বলতে গেল, এই উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের মদতদাতা কতিপয় শিক্ষকের অশোভন আচরণের কারণেই ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করে সরে আসেন অভিজিৎবাবু। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি বাম ছাত্র-ছাত্রীরা একমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ ব্যতীত অন্য কোনও মত প্রকাশ করতেই দেয় না এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। বরং ভিন্ন মতাবলম্বীরা বারবার লাঞ্ছিত হয়েছে এদের হাতে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অতি বাম ছাত্র-ছাত্রীরা দেশবিরোধী আওয়াজও তুলেছে। তদুপরি রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যত্রতত্র নানাবিধ নেশার আসর এবং অবাধ যৌনাচার। আর উচ্ছৃঙ্খল, নেশা এবং বিকারগ্রস্ত এই ছাত্র-ছাত্রীদের আড়াল করতে বারে বারেই এগিয়ে আসেন অতি বামপন্থী শিক্ষকশ্রেণী এবং একশ্রেণীর বাম বুদ্ধিজীবী। যাদবপুরের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস এই ছাত্রদেরই আড়াল করতে গিয়ে বলেছিলেন— 'আমার ছাত্ররা মেধায় সেরা, তাদের সঙ্গে অন্য কারও তুলনা চলে না।' 'মেধায় সেরা' ছাত্রেরা যখন আজ উপাচার্যের চামড়া গুটিয়ে নেওয়ার স্লোগান দেয়, তখন সুরঞ্জনবাবুকে গোপাল ও তার মাসির গল্পটি মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। সেই যে গোপাল, যে আদালতে মাসির কান কামড়ে দিয়ে বলেছিল— 'ছোটবেলা থেকে শাসন করলে আজ তো আমি অমানুষ হতাম না।' আসলে সুরঞ্জনবাবুরা ভুলে যান, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন শেষ পর্যন্ত তার স্রষ্টাকেই হত্যা করে। ■

শরিয়া আদালত মুসলিম মহিলাদের পায়ে শিকল পরাবার ছল

সৈয়দ তানভীর নাসরীন

অনেকদিন আগে একটি দৈনিক পত্রিকায় একটি লেখায় আমি লিখেছিলাম, প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি আসলে একজন মুসলমানই থেকে গেলেন, ভারতীয় হয়ে উঠতে পারলেন না। আমার সেই কথা যে সেদিন কতটা সত্যি ছিল সেটা আর একবার প্রমাণ করে দিলেন মাননীয় শ্রীযুক্ত আনসারি মহাশয় ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় শরিয়া আদালত স্থাপনের দাবিকে সমর্থন করে। ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় এই শরিয়া আদালত স্থাপনের দাবি কারা তুলেছে? আর কেউ নয়, সেই অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড বা এ আই এম পি এল বি। আমাদের মনে রাখতে হবে, গত ৪০ বছর ধরে মুসলমান মহিলাদের জন্য যাবতীয় সংস্কারের দাবিকে আটকে দিতে চেয়েছে এ আই এম পি এল বি। ৮০-র দশকের শাহবানু মামলার কথাই হোক, কিংবা হালফিলের মুসলমান মহিলাদের মেহরাম ছাড়া হজে যেতে দেওয়ার অধিকার, সবেতেই বাধা দিয়েছে এ আই এম পি এল বি। কিন্তু এবার তাদের প্রস্তাব একেবারে সরাসরি ভারতীয় সংবিধান এবং আইনি ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে। তারা আসলে ভারতবর্ষের মধ্যেই আর একটি 'ইসলামি' রাষ্ট্র বানাতে চায়।

> হামিদ আনসারির এহেন অদ্ভুত হাস্যকর যুক্তি আমার মনে হয় না কেউ কখনও শুনেছে। তাহলে ভারতবর্ষের সংবিধান থাকবার দরকার কীসের? সুপ্রিম কোর্টেরই বা দরকার কীসের? সব আলাদা আলাদা ধর্মের জন্য আলাদা আলাদা আইন বা আলাদা আলাদা বিচার ব্যবস্থা থাকলেই হয়। আসলে কি হামিদ আনসারিরা ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো দেখতে চান, না ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখতে চান?

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নাকভির বোন ফারহাত নাকভি। শরিয়া আইনের বিরোধিতা করায় সম্প্রতি এক মৌলবি তাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত করার হুমকি দিয়েছে।

ঠিক যখন সুপ্রিম কোর্টে নিকা হালালা, নিকা মুতাহ বা বহু বিবাহ প্রথাকে চ্যালেঞ্জ জানানো শুরু হয়েছে এবং দেশের মহামান্য আদালত এই প্রথাগুলি বাতিলের দাবিতে করা মুসলমান মহিলাদের আবেদনকে গ্রহণ করেছে, তখনই এ আই এম পি এল বি-র এই উদ্যোগ কেন? কারণ, আসলে তারা ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভাজন করতে চায়। সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাককে বাতিল করবার পর থেকেই নিজেদের মুসলমানদের 'অভিভাবক' বলে প্রচার পেতে ব্যস্ত কিছু সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল 'ইসলাম খাতরে মে হ্যায়' বা ইসলাম আক্রান্ত এই স্লোগান তুলে রাস্তায় নেমে পড়েছে। এদের মধ্যে এ আই এম পি এল বি যেমন রয়েছে, তেমনই ওয়াইসির রাজনৈতিক দল এম আই এম-ও আছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ওয়াইসি গত বছরের একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং মহারাষ্ট্রের মুসলমান প্রভাবিত জেলাগুলিতে 'সেভ শরিয়া' বা শরিয়া বাঁচাও শীর্ষক একটি প্রচারাভিমান চালিয়েছে। সেই প্রচারের মূল লক্ষ্যই ছিল মুসলমানদের এটা বোঝানো যে, বিজেপি সরকারের আমলে তাদের ধর্ম এবং শরিয়া বিপন্ন। ফলে তাদের এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং ভারতবর্ষে 'শরিয়া' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ওয়াইসি যে কথাটা তার রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বলছিলেন, এ আই এম পি এল বি সেই কথাটাই তাদের অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নামে তুলে ধরতে চাইছে। এবং এ আই এম পি এল

বি-র এই প্রস্তাবের পিছনে নিশ্চয় কংগ্রেসের পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে। কারণ আমাদের মাথায় রাখতে হবে সুপ্রিম কোর্টে তিন তালাকের মামলায় এ আই এম পি এল বি-র আইনজীবী ছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং গুরুত্বপূর্ণ নেতা কপিল সিবাল। আর এবার এ আই এম পি এল বি-র দেশের সর্বত্র শরিয়া আদালত স্থাপনের প্রস্তাবকে যিনি সোচ্চারে সমর্থন করলেন, সেই প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারিও তো আসলে কংগ্রেসের লোক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাই উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে গিয়ে একেবারে ঠিক প্রশ্নই তুলেছেন যে, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী যে তাঁর দলকে আসলে 'মুসলমানদের দল' বলে দাবি করেছেন, সেটা কি আসলে মুসলমান পুরুষদের দল? মোদীর খোঁচাটা ভীষণই চমৎকার এবং আমাদের মতো মুসলমান মেয়েদের জন্য একেবারে যথার্থ। অর্থাৎ কংগ্রেস কি শুধুই মুসলমান পুরুষদের কথা ভাবে, নাকি মুসলমান মহিলাদের জীবন-যন্ত্রণা, আশা-আকাঙ্ক্ষাও তাদের উপরে কোনও প্রভাব ফেলে? কারণ, সেই শাহবানু মামলার সময় থেকে রাজীব গান্ধী এবং তাঁর দল বার বার শুধুই মুসলমান নারীদের সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা' করেছে।

সবিনয়ে সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই, ভারতবর্ষে যদি ২০ কোটি মুসলমান থাকেন, তাহলে তার ১০ কোটি মুসলমান পুরুষ হলে ১০ কোটি মুসলমান নারীও। এবং এই মুসলমান নারীরা যেমন কোনও মতেই এ আই এম পি এল বি-এর মতো কোনও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অভিভাবকত্ব মেনে নিতে রাজি নয়, তেমনই রাজনৈতিকভাবে ওয়াইসিকে তাদের নেতা বলে মানে না। আমার সরাসরি প্রশ্ন, এ আই এম পি এল বি-কে মুসলমানদের অভিভাবক হিসাবে কে স্বীকৃতি দিল? ৭০-এর দশকে কংগ্রেস যে সংগঠনটিকে তৈরি করেছিল, তাদের হয়ে কথা বলার জন্য, সেই 'দালাল' সংগঠনটিকে আমরা মুসলমান মেয়েরা নিজেদের অভিভাবক বা প্রতিনিধি বলে কেন মনে করবো? যেদিন থেকে আমি প্রকাশ্যে এ আই এম পি এল বি-র বিরোধিতা শুরু করেছি এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাদের বিরুদ্ধে লিখেছি, সেদিন থেকে কম হুমকি, ফোনে এস এম এস বা চিঠি পাইনি। সোশ্যাল মিডিয়াতেও একদল মুসলমান পুরুষ আমাদের নামে কম গালমন্দ করেননি, এই শরিয়া আদালতের বিরুদ্ধে আমার লেখা দৈনিক প্রকাশিত হওয়ার পরও সুদূর মহারাষ্ট্র বা অসম থেকে হুমকি ফোন পেয়েছি। কিন্তু তাতে আমি বা আমার মতো যে সব মুসলমান মহিলা নিজেদের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করছেন, তারা ভয়ও পাবেন না, পিছিয়েও যাবেন না।

শরিয়া আদালত মানে কী? তাহলে কি এখানে ব্যভিচারের অপরাধে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হবে? আর চুরির অপরাধে কারও হাত কেটে নেওয়া হবে? কারণ শরিয়া তো অনেক ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে এই ধরনের শাস্তির সুপারিশই করে। নাকি এই শরিয়া আদালত শুধুই মুসলমান মহিলাদের পায়ে বেড়ি পরানোর নতুন পরিকল্পনা? সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাক নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পরে, আমরা মুসলমান মহিলারা যখন ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী অন্য মহিলারা যে অধিকার পান, তার দাবিতে সরব হয়েছি এবং আদালতের দরজাতে কড়া নাড়ছি, তখন এ আই এম পি এল বি-র এই সিদ্ধান্ত কি আসলে মুসলমান মহিলাদের ফের ঘেরাটোপে আটকে রাখার উদ্যোগ? কারণ মুসলমান মহিলারা এখন সম্পত্তির উপর ন্যায্য অধিকার চায়, বহু বিবাহকে নিষিদ্ধ করতে চায়। সেই জন্যই কংগ্রেসের মদতে এ আই এম পি এল বি দেশের প্রতিটি জেলায় শরিয়া আদালত খোলার নাম করে মুসলমান মহিলাদের পায়ে শিকল পরাতে চায়?

প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি অসাধারণ সব যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলমানরা প্রতিটি জেলায় শরিয়া আদালত চাইতেই পারে। হামিদ আনসারির মতো তথাকথিত পণ্ডিত এবং প্রাক্তন কূটনীতিবিদের যুক্তিজালে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তাহলে কি পঞ্জাবে শিখদের জন্য আলাদা আদালত চালাবে গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি, আর দেশের উত্তরপূর্বে বা গোয়া যেখানে খ্রিস্টানদের সংখ্যাধিক্য বেশি সেখানে কোনও খ্রিস্টান সংগঠন আলাদা বিচার ব্যবস্থা চালাবে? এহেন অদ্ভুত হাস্যকর যুক্তি আমার মনে হয় না কেউ কখনও শুনেছে। তাহলে ভারতবর্ষের সংবিধান থাকবার দরকার কীসের? সুপ্রিম কোর্টেরই বা দরকার কীসের? সব আলাদা আলাদা ধর্মের জন্য আলাদা আলাদা আইন বা আলাদা আলাদা বিচার ব্যবস্থা থাকলেই হয়। আসলে কি হামিদ আনসারিরা ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো দেখতে চান, না ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখতে চান?

বিশ্বকাপ ফাইনালে ফ্রান্সের জয়ের পর যখন ফরাসি জাতীয় সংগীত বাজছিল, তখন ফ্রান্স দলের অনেকেরই চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু বইছিল। এই ফ্রান্স দলের বড় অংশই কিন্তু অভিবাসী, তাঁরা কেউ আফ্রিকা থেকে এসেছেন, কেউ হয়তো বা পশ্চিম এশিয়ার দেশ থেকে এসেছেন, কিন্তু এঁরা ফ্রান্সের নাগরিক হয়ে উঠতে পেরেছেন, এঁরাই সেই দেশের জার্সি গায়েই বিশ্বসেরা দলের শিরোপা পেতে চেয়েছেন। তাই তারা শেষ পর্যন্ত ফরাসি, ফরাসি জাতীয় সংগীতই তাদের জাতীয় সংগীত, সেই বহু প্রাচীন জাতীয় পতাকাই আফ্রিকার এক যুবক গায়ে জড়িয়ে নিজেকে সেই ফরাসি আত্মার শরিক বলে মনে করেন। তারা কেউ নিজেদের আফ্রিকার অতীতকে মনে রেখে সেই ভাষার শব্দ জাতীয় সংগীতে ঢোকাতে বলে না, কিংবা পশ্চিম এশিয়ার অভিবাসী ছেলেটির জাতীয় পতাকাকে গায়ে জড়িয়ে নিতে অসুবিধা হয় না। এটাই জাতীয়তাবাদ।

এই সব দেখেও কি হামিদ আনসারিরা শিখবেন না, নাকি ভারতীয় জাতীয়তা-বোধকে আঘাত করার জন্য শরিয়া আদালতের প্রস্তাবকে উৎসাহ জুগিয়ে যাবেন?

(লেখিকা অধ্যাপিকা ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার।)

শরিয়ত আদালতের দাবি দেশদ্রোহিতার নামান্তর

অশোক কুমার চক্রবর্তী

সম্প্রতি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ও কয়েকটি মুসলমান সংগঠন দাবি করেছেন যে ১৯৩৭ সালের শরিয়ত আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় আলাদা বিচার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ সালের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়। দুই স্বাধীন ডোমিনিয়ন ভারত ও পাকিস্তান তৈরি করা হয়। এই আইনের মাধ্যমেই ভারতবর্ষের কন্সটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্‌ব্লি গঠন করা হয়। কন্সটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্‌ব্লিকে ভার দেওয়া হয় ভারতীয় সংবিধান তৈরি করার জন্য। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর এই সংবিধান রচনা ঘোষণা করা হয়। ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০ ভারতীয় সংবিধানের তিনটি মূল সংবিধান ভারতীয় পার্লামেন্টে পেশ হয়। প্রথমটি ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা অনুযায়ী পেন্টার আর্টিস্ট দ্বারা অঙ্কনের মাধ্যমে রচিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি যথাক্রমে হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা। সংবিধানের প্রস্তাবনা পর্বে ঘোষণা করা যে ভারতবর্ষ স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। এবং ভারতের জনগণ নিজেরাই নিজেদেরকে সংবিধান উপহার দিলেন। জনগণের জন্য একই বিচার। স্বাধীনতা, সমতা, ও ভ্রাতৃত্ব অঙ্গীকার করা হলো। এই প্রস্তাবনা পর্বকেই সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ সংবিধানের মূল কাঠামো বলে ব্যাখ্যা করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হবার পরেও ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সকল নাগরিকের জন্যে একই বিচার, স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। ইংরেজ শাসক প্রবর্তিত ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যে সকল আইন চালু ছিল, সেগুলি নির্ভর করছিল ভারতীয় পার্লামেন্ট দ্বারা নবীকরণ অথবা চালু রাখার বিষয়টির অনুমোদন।

১৯৩৭ সালে ইংরেজরা তাদের শাসনকার্য কায়েম করার জন্য শরিয়ত আইন পাশ করে। এই

জাফরিয়াব জিলানি

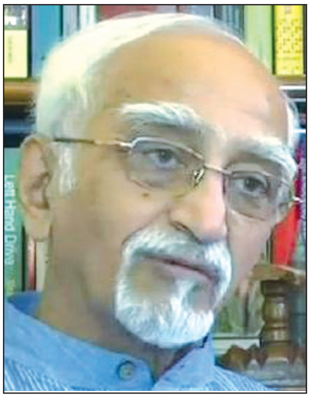

হামিদ আনসারি

আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষের মুসলমানরা তাদের পার্সোনাল ল অনুযায়ী দেওয়ানি অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভাবে পার্সোনাল ল-তে ফৌজদারি বিধি কার্যকর করা হয়নি।

ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার পর্বে বিশেষ কয়েকটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে সংবিধান পূর্ববর্তী সব আইন, যেগুলি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল এবং এই আইনগুলি যদি মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হয় তাহলে সেই আইনগুলি বাতিল বলে গণ্য করা হবে। সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সংবিধান পূর্ববর্তী আইন বাতিল বলে গণ্য হবে— একথা বলা হয়েছে। সংবিধান পূর্ববর্তী আইন ভারতবর্ষে চালু থাক বা না থাক, মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী এই সকল আইন বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মৌলিক অধিকারের ১৩নং অনুচ্ছেদে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, সরকার নাগরিকদের মধ্যে আইনগত ব্যাপারে কোনও বৈষম্য করতে পারবে না এবং ভারতীয় সকল নাগরিকই আইনের চোখে সমান মর্যাদা পাবেন। এই ১৪ নং অনুচ্ছেদটি প্রস্তাবনা পর্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমতার কথার ভিত্তিতেই সংযোজন করা হয়েছিল। ভারতীয়

সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাক প্রথাটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পর থেকেই ব্যক্তিগত আইন ও শরিয়ত আদালত চালু রাখার পক্ষে যাঁরা দাবি করছেন, তাঁরা সুপ্রিম কোর্টকেও মানেন না এবং ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কর্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করছেন।

সংবিধানে সমতার কথাটি একটি সদর্থক শব্দ। সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে সরকারের উপরে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ ও জন্মস্থান অনুযায়ী কোনওরকম বৈষম্য ও বিভেদ করার উপর।

নির্দেশাত্মক নীতি পর্বে ৪৪ নং অনুচ্ছেদে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অভিন্ন দেওয়ানি কার্যবিধি প্রচলন করবার কথা বলা হয়েছে। ৪২তম সংবিধান সংশোধন প্রস্তাবনা পর্বে ভারতবর্ষকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবেও ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের মূল কাঠামো, মৌলিক অধিকার, নির্দেশাত্মক নীতি পর্যালোচনা করলে একথা বলা যায় যে, সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য ছিল এবং আছে যে ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে একই আইন ব্যবস্থা চালু করা। সুপ্রিম কোর্ট এই একই আইন ব্যবস্থার ১৪ নং অনুচ্ছেদটিকে বহু রায়ে বারবার উল্লেখ করেছে এবং কোনোভাবে কোনো বৈষম্যমূলক আইনকে বাতিল বলে গণ্য করেছে। ৪৪নং অনুচ্ছেদ সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে পড়লেও সুপ্রিম কোর্ট কয়েকটি রায়ে অভিন্ন দেওয়ানি কার্যবিধি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে মতামত ব্যক্ত করেছে। ১৯৭৫ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যের কথা সংযোজন করা হয়েছে। ৫১ (ক) অনুচ্ছেদে সংবিধানে বলা হয়েছে যে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে ভারতীয় সংবিধান ও তার আদর্শকে মান্যতা দেওয়া।

উপরিউক্ত বিচারে ১৯৩৭ সালের শরিয়ত আইন এবং শরিয়ত আইন অনুযায়ী আলাদা বিচার ব্যবস্থার দাবি অযৌক্তিক ও সংবিধান বিরোধী। প্রথমত, ১৯৩৭ সালের শরিয়ত আইন ভারতীয় সংবিধান পূর্ববর্তী আইন এবং ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পর্ব, মৌলিক অধিকার পর্ব এবং নির্দেশাত্মক নীতির বিরোধী। একই সংবিধানের একই বিচার ব্যবস্থায় এবং নাগরিকদের সংবিধানের মান্যতা দেবার কথা বলা সত্ত্বেও শরিয়ত আইন ও শরিয়ত আদালত চালু করার কথাটি শুধু অসাংবিধানিক নয়, এটি জাতীয়তা বিরোধীও। সংবিধান অনুযায়ী কোনও নাগরিক কোনও আলাদা ব্যবস্থার কথা কখনোই দাবি করতে পারে না যখন মৌলিক কর্তব্যে সংবিধানকে মেনে চলার কথা বলা হয়েছে।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট মুসলিম পার্সোনাল ল অনুযায়ী তিন তালাক প্রথাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পর, মুসলমানদের একাধিক বিবাহ, তালাক প্রাপ্ত নারীর পুনর্বিবাহ— এই সংক্রান্ত কয়েকটি মামলার কথাও শোনা যাচ্ছে। সে জন্যই কিছু রাজনৈতিক দলের সমর্থনে কিছু মুসলিম সংগঠন ভারতীয় সংবিধান বহির্ভূত আলাদা বিচার ব্যবস্থা ও পার্সোনাল আইনের কথা বলে চলেছেন। সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাক রায়ে বারবার সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে তিন তালাক প্রথাটিকে সংবিধান বিরোধী বলে উল্লেখ করেছে। তাই শরিয়ত আইন চালু রাখা বা শরিয়ত আদালত গঠন করার বিষয়টি সংবিধান বিরোধী দাবি হিসাবে প্রমাণিত হচ্ছে। মৌলিক অধিকারের ১৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ধর্মের ভিত্তিতে কোনওরকম বৈষম্যের বিষয়ে যদি সংবিধানে নিষেধাজ্ঞা থাকে তাহলে একই সাধারণতন্ত্রে একই নাগরিকরা একই সংবিধানের আওতায় কী করে এই জাতীয়তা-বিরোধী দাবি তুলছে, তা নিয়ে জনগণের মধ্যে অনেক প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি মুসলমান দেশও মুসলিম ব্যক্তিগত আইন প্রয়োগের বিষয়ে উৎসাহী নয়। ভারতবর্ষে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন চালু রাখার দাবির একটাই উদ্দেশ্য যে যতদিন না এই পার্সোনাল ল এর দাবিদাররা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারবেন, ততদিন এই প্রথাকে চালু রাখা এবং ঠিক সময়ে দেশভাগের দাবিতে সোচ্চার হওয়া।

সংবিধান রচনার পর থেকেই কয়েকটি রাজনৈতিক দল ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটির অপব্যাখ্যা করে চলার ফলে ভারতবর্ষেরই কয়েকটি সংগঠন এই ব্যক্তিগত আইন প্রচলন করার পক্ষে দাবি করতে সাহস পাচ্ছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা মেনেই ভারতীয় সংবিধান রচনা করা হয়েছিল এবং ভারতীয় নাগরিকদের একই আইন উপহার দেবার কথা অঙ্গীকার করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাক প্রথাটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পর থেকেই ব্যক্তিগত আইন ও শরিয়ত আদালত চালু রাখার পক্ষে যাঁরা দাবি করছেন, তাঁরা সুপ্রিম কোর্টকেও মানেন না এবং ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কর্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করছেন। ■

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN
করুন
উন্নতি করুন
DRS INVESTMENT
Contact :
9830372090
9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
uti UTI Mutual Fund
HDFC MUTUAL FUND
SBI MUTUAL FUND A partner for life.

যাদবপুরে 'হোক অনশন' বিপ্লব

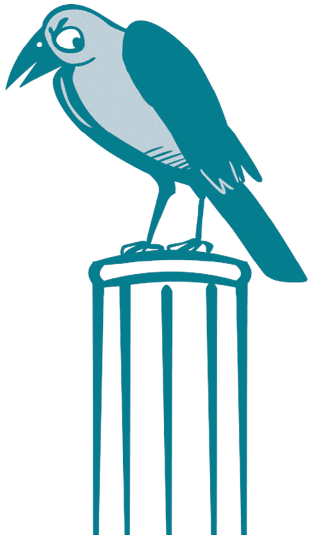

একদা এক বঙ্গকবি লিখেছিলেন, 'বাংলার ছেলে পেটে তার পিলে কোমরে ঘুনসি বাঁধা।' দীর্ঘলালিত বামপন্থী প্রগতিশীলতার ফলে সেই কাব্যপুটটির মধ্যে একটি গুণগত পরিবর্তন দেখা গেছে। বাংলার ছেলের পেটে পিলে আছে ঠিকই, কিন্তু সেই পিলেটি এখন অতিবুদ্ধিমান বুজরুকিতে ভরা; এবং ঘুনসিটি বিপ্লবের তার দিয়ে বাঁধা। সেই জন্যেই যেখানে ছেলে-মেয়েদের সমাবেশ বেশি, সেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই মাঝে মাঝেই ভূমিকম্পের মতো বিপ্লব ভুস করে ওঠে, আবার ফুস করে মিলিয়ে যায়। তখন বৈপ্লবিক আন্দোলনের মহা-অস্ত্র ব্যাঞ্জো, গিটার, ডুগডুগি, ও গোপীযন্ত্র নিয়ে ঘরে ফেরার পালা। যাদবপুরে সম্প্রতি কুরুক্ষেত্রের পর শান্তিপূর্বে তারই এক জম্পেশ নাটক হয়ে গেল।

ত্রিগুণা সেন মশায় প্রাণপাত করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা বোঝা যায় না। কিন্তু প্রত্যক্ষত সেটি সকলের গান্ধারী সমর্থনে যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূতিকাগার হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ছাত্ররা তবু বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে যাদবপুর মঠতলে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাত্রীপান্নারা এখানকার পার্মানেন্ট স্টাফ এবং নিঃসন্দেহে খুবই ছাত্রদরদি যতক্ষণ না তার আঁচ গায়ে এসে পড়ে। সেই যাদবপুরেই সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের এক পাণ্ডা দীর্ঘদিন কোঁচার পত্তন করে কাটিয়ে এখন পেনশনের পান চিবোচ্ছেন। আরও যাঁরা বিপ্লবের ধাত্রীর কাজ করার জন্যে ঘাপটি মেরে আছেন, ছাত্র আন্দোলনের প্রেরণার উৎস, তা ধরা বড়ো শক্ত।

যাদবপুরে ছাত্র আন্দোলন অবশ্য বরাবর মহতী সব কারণের জন্যে হয়ে থাকে। যেমন সত্তরের দশককে মুক্তির দশক করে তোলার মহান উদ্দেশ্য কিংবা কাশ্মীরের স্বাধীনতা অথবা নাগাল্যান্ডের স্বাধীনতা, নিদেনপক্ষে ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে। সেগুলি সবই অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের চৌহদ্দির মধ্যে বীর হনুমানের লেজ নাড়াতেই সাফল্যমণ্ডিত হয়। কিন্তু এবারে নাকি তুচ্ছ এক কারণে, নেহাতই ভর্তির ব্যাপারে প্রবেশিকা পরীক্ষা বাতিলের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অনশনের হুমকিতেই কাজ হাসিল, কোনওরকম অ্যাকশানের প্রয়োজন পড়েনি।

যাদবপুরের ব্যাপারে বলেই আমরা উন্মুখ হয়েছিলুম, কোনওরকম 'হোক অ্যাকশান'-এর অভিনবত্ব দর্শনের জন্যে। হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি, হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি— 'হোক কলরব'। প্রতিবাদী সেই হোক কলরবের লেজ ধরে এসেছিল 'হোক চুম্বন'। সে কী মজা মাইরি, বিপ্লবও হচ্ছে, চকাচক চুম্বনও হচ্ছে। তারপরে প্রতিবাদের হাতিয়াররূপে এল সেই যাদবপুরের চত্বর ছাড়িয়ে বনফুলিয় ভাষায় লদকালদকির 'হোক আলিঙ্গন'। যৌন বুভুক্ষু দেশে উপবাসী যৌবনের বাঁধ ভেঙে দেওয়ার সেই উল্লাসে বুড়োভামদের চক্ষু চড়কগাছ। তার পরে বৈপ্লবিক প্রতিবাদে, কোথায় হবে 'হোক সঙ্গম'; একার প্রতিবাদে যদি জোশ তেমন না জমে, তাহলে জোড়ায় জোড়ায় সম্মিলিত প্রতিবাদের ধাক্কায়, সকলের পিলে চমকে দিতে পারলে, বাজিমাত।

বলিহারি মিচকে উপাচার্যমশায় চাকরি বজায় রাখতে ছাত্রদের দাবি এককথায় না মেনে আজ যাচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে, কাল যাচ্ছেন রাজ্যপালের কাছে। তিনি জানেন না, তেমন বুঝলে আমরা লঘুগুরু মানবো না, তেনার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে দেব। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বরযাত্রী' গল্পের কথা চলে আসে— বরযাত্রীদের বেয়াদপিতে ম্যানেজমাস্টার 'জগুদা' বলে ওঠেন, মনে থাকে যেন এটা হচ্ছে বাজে শিবপুর। এদিক ওদিক করেছো তো মরেছো। তেমনি আমরা বলতে বাধ্য, মনে থাকে যেন এই সেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে বিপ্লবের ধাক্কায় উপাচার্য গোপাল সেনকে বলি দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান উপাচার্যের ভাগ্য ভালো, আমরা তো শুধু তেনার ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার কথা বলেছি, প্রাণে মারবার কোনও কথা নেই। 'রাখালি সেই তো মল খসালি, তবে কেন করলি চালাকি।'

মাননীয় উপাচার্যমশায় আপনি বড্ডো সেয়ানা। কলকাতায় আপনি পাঁচ বছর রেড ব্রিগেড ও পাঁচ বছর গ্রিন ব্রিগেড সামলে যাদবপুরে এসেছেন। এবারে এসো সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। শিক্ষামন্ত্রকের রেড গুন্ডাদের কাছে মাথা নোয়াতে পারো, পরবর্তী গ্রিন গুন্ডাদের কাছে দাসখত লিখে দিয়ে, চাকরি বজায় রাখতে পারো; তাহলে যাদের জন্যে তোমার বেতনের রমরমা সেই ছাত্রদের কথা তুমি শুনবে না কেন? আমরা ঐক্য, আমরা বল, যাদবপুরের ছাত্রদল, আমাদের দাবি মানতে হবে। সরকারের ঘেঁটু হয়ে নতুন ধারা চালু করতে গেলে আমাদের বিপ্লবের শক্তির কী হবে? বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবার তোমার বধিব পরান।

মহামহিম উপাচার্য স্যার, ভেবেছেন, আপনারা যে ইস্কুলে পড়েছেন, আমরাও সেই ইস্কুলের ছাত্র! কিন্তু খেয়াল থাকে যেন, সে জমানা কবে পার হয়ে গেছে। আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদের কলকাতা আর

ত্রিগুণা সেন, গোপাল সেনদের যাদবপুর আর নেই। তখন ভদ্র অতি, শান্ত অতি বাঙালি সন্তান কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসত লেখাপড়া শিখতে ও তারপরে গোলামি করতে। কিন্তু সে সুবিধাভোগী ভদ্র যুগ কবে অস্তমিত। কেননা বিশ্বমুক্তির প্রেরণায় এসেছে কমিউনিস্ট যুগ। মনে নেই, আমাদের গ্যারংলাস কমিটেড কমিউনিস্ট মিত্তিরমশায়ের সেই মহান উক্তি, আমি ভদ্দরলোক নই, আমি কমিউনিস্ট।

সময়ের তালে তালে যদি চলতে না পারো, তবে মরতেই হবে, হবে মরতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বছর তাঁবেদারি করার সময় বোধ হয় উপাচার্য মশায়ের খেয়াল হয়নি যে, এখন কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের বিদ্যাচর্চা থেকে কত পৃথক। মহামতি শিক্ষাবিদরাই বলছেন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি বর্জন করলে চলবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগে যে উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়ে থাকুক, এখন সেটি রাজনীতি চর্চার সূতিকাগার। তবে যেহেতু রাজনীতিটা মূলত রাস্তার রাজনীতি, গুন্ডার দাপটে নিয়ন্ত্রিত, তাই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এখন হলো গুন্ডা তৈরির কারখানা। আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, গুন্ডামির দাপটে একদিন মিনিস্টার হবে।

আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যে মহান গুন্ডারাজত্বের আধুনিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার সূচনা হয় সেই মহান মুক্তিপন্থী জমানায়। শিক্ষাক্ষেত্রের সেই মহান ট্র্যাডিশন গ্রিন জমানাতেও অব্যাহত। শিক্ষার অনিলায়নে একদিকে যেমন পার্টিপুষ্ট বকলস পরা পদলেহী মূর্খপণ্ডিতদের দ্বারা শিক্ষক সমাজকে চোর-জোচ্চোরের আখড়া করে তুলেছিল। অন্যদিকে অতিবিপ্লবী নকশাল আন্দোলন ছাত্র সমাজকেও মূর্খ মেগালোম্যানিয়াক চারু মজুমদারের বিপ্লবের ধাত্রী করতে গিয়ে, শিক্ষাবিচ্যুত গুন্ডাতে পরিণত করে। কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্র গুন্ডারাই একদিন সর্দার হয়ে শিক্ষক গুন্ডা বা মিনিস্টার গুন্ডা হয়ে ওঠে। আর মাঝখানে চলছে টাকার খেলা। সরকারি মদতে ভর্তির ব্যাপারে এই টাকার খেলাটা এখন খুব জমে উঠেছে। পার্টি করা ও টাকা করাটা এখন শিক্ষার মেরুদণ্ড এবং সেই শিক্ষাই এখন জাতির মেরুদণ্ড।

সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যভাবে, এই টাকার খেলায় যদি সরকারি মদত না থাকে তাহলে একদিনে এই প্রকাশ্য নষ্টামি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভর্তি হওয়ার সময় ইউনিয়নবাজি বা ইউনিয়ন লিডারদের টাকা খাওয়ার প্রশ্ন আসে কী করে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রধান হয়েছেন, তাঁর বাড়িতে গার্ড দেওয়ার জন্যে শতাধিক পুলিশ মোতায়েন, কিন্তু ভর্তির সময় যে টাকার খেলা চলছে তা তিনি কিছুই জানেন না। মুখ্যমন্ত্রীর ছাত্রাবস্থায় যদি এই টাকার খেলা থাকতো, তাহলে তেনাকে বোধ হয় আর কলেজের মুখ দেখতে হতো না। কাগজের খবর দেখে তিনি যেন ঘুম ভেঙে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন, ক্যা হুয়া।

অথচ এই জমানাতেই, শিক্ষালয়ে ভর্তির সময় টাকার খেলা বন্ধ করার জন্যে অনলাইনে ভর্তির ব্যবস্থা করতে গিয়ে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর চাকরি যায়। একইভাবে রবীন্দ্রভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য অধ্যাপক চিন্ময় গুহ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ভর্তির ব্যবস্থা করেন, তখন ছাত্র ইউনিয়নের পাণ্ডাদের সঙ্গে বাইরের গ্রিন গুন্ডারা উপাচার্যের ঘরে দাপাদাপি করে রবীন্দ্রনাথের ছবি বুট দিয়ে মাড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করে। গুন্ডাদের দাবিতে শেষ পর্যন্ত উপাচার্যের চাকরি যায়।

পূর্ববর্তী তিন দশকের রেড ছাত্র গুন্ডাদের মতোই, বিগত সাত বছর গ্রিন গুন্ডাদের দাপটে, একচ্ছত্র তোলাবাজি ও গুন্ডামি অবাধে চলছে। শাস্ত্রকথিত, 'হলে কলা এবং মলে কলা'রও মতো শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র হতে গেলেও টাকা লাগে এবং শিক্ষক হতে গেলেও টাকা লাগে। ছাত্রদের বেলায় ইউনিয়ন লিডার, আর মাস্টারদের বেলায় এমএলএ, এমপি। ফেলো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি পার্টির পর।

নেতা-নেত্রীর সতীপনার ঢপকেত্তনের ঘোমটার আড়ালে ছাত্র গুন্ডামির সেই খেমটা নাচ প্রকাশ্যে চলছে। অথচ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, কী রেড জমানায়, আর কী গ্রিন জমানায় সরকারি নীতিতে পুলিশি মদত ছাড়া বিরোধীহীন সরকার পার্টির ছাত্র ইউনিয়ন ও তাদের তোলাবাজি অসম্ভব। সরকারি মদতে একদিন ইউনিয়নে বামপন্থী ছাত্র ফেডারেশনের সে কী প্রতাপ! আজ তাদের পেছনে পুলিশ নেই, তারা ইঁদুর ছুঁচোর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আর সেদিন যে গ্রিন পার্টির নেংটি ইঁদুরেরা গণতন্ত্র গণতন্ত্র করে কিচিরমিচির করতো, তারা পুলিশ-মুনির জল পেয়ে এখন হালুম হালুম করছে, আর ভর্তির সময় টাকা তুলছে। মনে পড়ে লাল জমানায় সরকারি মহাফেজখানায় কো-অর্ডিনেশন কমিটির সে কী দাপট, আজ মন্ত্রীকে তড়পাচ্ছে, কাল সচিবকে শাসাচ্ছে; মহাবীরবৃন্দ এখন কোন গর্তে লুকোলি বাপধন। আসলে সরকার যার, পুলিশ তার; পুলিশ যার গুন্ডা তার; গুন্ডা যার ছাত্র ইউনিয়ন তার এবং লুঠমারের মৃগয়াক্ষেত্র তার।

ভর্তির সময়, ছাত্রদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা বাধ্যতামূলক করা তো কোনও বিরাট ব্যাপার নয়, বিশেষ করে দু'একদিনের জন্য। ভর্তিপর্ব শেষ হলে তার পরে আবার কলেজ আরম্ভ হতে পারে। তারপর 'নবীন বরণের' নামে আবার ইউনিয়নবাজির প্রকাশ দেখা গেলে তাকে অনায়াসেই কঠোর হাতে দমন করা যায়। ইউনিয়ন নির্বাচনের সময়ও যদি লিংডো কমিশনের সুপারিশ মতো, ইউনিয়ন নির্বাচনে পুলিশি তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ হয় তাহলে এই ছাত্র গুন্ডার দৌরাত্ম্য বন্ধ হতে বাধ্য। কিন্তু তাহলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিরিশ শতাংশ আসনে ভোট অবান্তর হবে কোন উপায়ে।

অনুরূপভাবে ছাত্রভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা থাকবে কী থাকবে না, সেটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথা টিচার্স কাউন্সিলের ব্যাপার, তা নিয়ে ছাত্রদের কোনও ভূমিকা থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে অনশনই হোক আর চুম্বন, যে কোনও অবাঞ্ছিত উপদ্রব কঠোর হাতে মোকাবিলা করা আবশ্যক। ছাত্ররা নিজেদের সুবিধা, অসুবিধা, শিক্ষাক্রম নিয়ে আন্দোলন করতে পারে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নিয়ে তাদের কোনও ভূমিকার অস্তিত্ব নেই। অবশ্য নাটের গুরু শিক্ষকদের কায়েমি স্বার্থ এর মদতদাতা হলে অন্য কথা। ■

ছাত্র ভর্তিতে তোলাবাজি

পশ্চিমবঙ্গের আর এক নাম আজ তোলাবাজির স্বর্গ। তোলাবাজি এ রাজ্যে পেয়েছে শিল্পের মর্যাদা। তাই তোলাবাজিতে কোনও পুরস্কার ঘোষিত হলে প্রথম পুরস্কারটি থাকবে এ রাজ্যের জন্য বাঁধা। সেই কারণে অবশ্য অনেকেই এই সরকারকে বলে থাকে দুর্নীতিপরায়ণ তোলাবাজদের সরকার। আর তোলাবাজি কোথায় নেই? নির্মাণ শিল্প, শিল্প-কারখানা, বালি-পাথরের খাদান, ছোটো-বড় ব্যবসাকেন্দ্র, কুটির শিল্প, দোকানদারি, জমি-বাড়ির দালালি, ছাত্রভর্তি সর্বত্র সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে তোলাবাজি। আর এই বিনা পুঁজির ব্যবসায় নেমে পড়েছেন শাসকদলের বহু ছোটো-বড় নেতা-নেত্রী। তাঁদের একটাই কথা— 'ফেল কড়ি মাখো তেল।' অর্থাৎ তোলা দাও, ব্যবসা কর।

এহেন পরিস্থিতিতে শাসকদলের ছাত্রসংগঠনের ছাত্রনামধারী এক শ্রেণীর দুষ্কৃতী সমাজ-বিরোধী বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির এই মরসুমে নেমে পড়েছিল ছাত্রভর্তির নামে তোলাবাজিতে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও তারা কলকাতা-সহ মফস্বলের বিভিন্ন কলেজে ক্যাম্পাসে দাপিয়ে বেড়িয়েছে 'সিট' বিক্রির কারবারে। এক একটা 'সিট' বিক্রি হচ্ছিল ২০ হাজার থেকে ২/৩ লক্ষ টাকায়। ফলে বঞ্চিত হচ্ছিল উচ্চশিক্ষা থেকে বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী। আর অযোগ্য শিক্ষার্থীরা অঢেল টাকার বিনিময়ে পাচ্ছিল উচ্চশিক্ষার সুযোগ। এখানেই শেষ নয়, সুযোগ বুঝে বিনা পুঁজির এই মরশুমি ব্যবসায় নেমে পড়েছিল তৃণমূলের অনেক গুন্ডা-মস্তানও। এমনকী, 'খদ্দের' ধরতে এরা নামিয়েছিল 'এজেন্ট'ও। ছাত্র-ছাত্রীদের হাত ধরে টানাটানি, তর্কাতর্কি, দরাদরি, মারামারি— কী ঘটেনি ক্যাম্পাসে, সংলগ্ন রাজপথে? আর এভাবে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তিতে অরাজকতা সৃষ্টি তথা মেধাবী শিক্ষার্থীদের 'সিট' অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রি হয়ে যেতে থাকলে এ রাজ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন হবে কী করে? তবে অবাক হওয়ার মতো ঘটনা এই যে, 'সিট' বিক্রির ন্যায় কুকর্মের সঙ্গে কোনও কোনও কলেজের একশ্রেণীর শিক্ষাকর্মীও যুক্ত ছিলেন বলে সংবাদে প্রকাশ। তবে জানা যায়নি, শাসকদল সমর্থক ওই সব কলেজের কোনও 'বড়মাথা' বা 'রাঘববোয়াল' এর সঙ্গে জড়িত কিনা। এ তো 'সর্ষের মধ্যে ভূত।' শাসকদলের ছত্রছায়ায় চলছে শুধু লুট। তবে এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ এবং ভুক্তভোগীদের বিশ্বাস, শাসকদলের ক্ষমতাবানদের মদত বা প্রশ্রয় ভিন্ন এমন অনৈতিক কাজ হতেই পারে না। আর এর অর্থ, শাসকদলের প্রভাবশালীদের একটা বড় অংশ নেমে পড়েছিলেন 'হরির লুট'-এর বাতাসা কুড়োতে। শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য ছাত্রভর্তি নিয়ে তোলাবাজির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি ছেড়েছেন। অভিযুক্তদের কিছুতেই রেয়াত করা হবে না এবং দল তাদের দায়ও নেবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কথায় বলে না, 'চোরা শোনে না ধর্মের কাহিনী!' তাই শিক্ষামন্ত্রীর হুঁশিয়ারি ও সাবধানবাণীকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তোলাবাজরা চালিয়ে যাচ্ছিল অবৈধ ব্যবসা। কলেজ চত্বরে পুলিশ পোস্টিং করা হলেও তারা ছিল 'ঠুঁটো জগন্নাথ' হয়ে। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে মাঠে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি একটি কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে বলেছেন, 'টাকা নয়, মেধাই হবে যোগ্যতার মাপকাঠি।' তিনি ছাত্র ভর্তিতে তোলাবাজি বা আর্থিক দুর্নীতি রুখতে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলতেই পুলিশের জালে ধরা পড়েছে শাসকদলের বহু রাঘব বোয়াল। একজন তো আবার জয়পুরিয়া কলেজের ছাত্রনেতা ও ছাত্রসংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে তৃণমূলের কয়েকজন নেতা-মন্ত্রীর। স্বভাবতই ছাত্র ভর্তির তোলাবাজির ঘটনায় শাসকদল ও সরকার যথেষ্ট 'ব্যাকফুটে'। এর পরেও তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কী করে ছাত্রভর্তিতে তোলাবাজি, দুর্নীতি নিয়ে খবর করার জন্য সংবাদ মাধ্যমকে দোষারোপ করেন? বিরোধীরা অবশ্য তৃণমূলের ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তারিকে স্রেফ 'আই ওয়াশ', দুর্নীতিকে ধামাচাপা দেওয়া, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা ইত্যাদি বলে শাসকদল ও সরকারের সমালোচনা করেছেন।

চিঠিপত্র

ভর্তিতে দুর্নীতি রুখতে বিরোধীরা বারবার বলে আসছেন 'অন লাইন' ছাত্র ভর্তির কথা। কিন্তু সরকার কিছুতেই তাতে সায় দেয়নি। কেন? তবে কী দুর্নীতিকে জিইয়ে রাখতে? অবশ্যই। সারা ভারতে 'সিট' বিক্রির নজির নেই। এ রাজ্যে আছে। কারণ, সমাজবিরোধীদের পুষতে তোলাবাজির সুযোগ না দিলে বুথ দখল, রিগিং, ভোট লুট করে তৃণমূলকে জিতিয়ে আনবে কারা?

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

হিন্দু মহাসভার সূচনাপর্ব এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য

১৮৮২ সালে লাহোরে হিন্দুমহাসভা স্থাপিত হয়। এর উদ্যোক্তা প্রবাসী বাঙালি নবীন্দ্র চন্দ্র রায় ও রায়বাহাদুর চন্দ্রনাথ মিত্র। অবশ্য ১৮৭০ সাল থেকেই হিন্দুদের সংগঠিত করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়। লাহোরের হিন্দুসভার অনুকরণে বিভিন্ন স্থানে হিন্দুসভা গড়ে ওঠে। কিন্তু এদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল না। রাজনৈতিক কারণে এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করবার প্রয়োজন বিশেষ রূপে অনুভূত হওয়ায় ১৯১০ সালে এলাহাবাদে এক সর্বভারতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মদনমোহন, ভাই পরমানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। এরপর থেকেই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু মহাসভা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৪ সালে হীরেন্দ্র দত্তর সভাপতিত্বে বাংলায় হিন্দু মহাসভার শাখা স্থাপিত হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি মহাসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী সাভারকার যোগ দেবার পর থেকেই এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ব্রিটিশ সরকার হিন্দুমহাসভাকে স্বীকৃতি দিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধির করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিল। গান্ধী হত্যার সঙ্গে হিন্দু মহাসভার যোগাযোগ থাকার অভিযোগ তুলে এর প্রভাব হ্রাস করার প্রচেষ্টা হয়। (সূত্র : রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩০)

তখন 'বিজলী' ছিল প্রধানত রাজনৈতিক বিষয়ক সাপ্তাহিক। প্রথম প্রকাশ ১৯২০। প্রতিষ্ঠাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। যখন মৃণালকান্তি বসু সহ সম্পাদক তখন এক সাক্ষাৎকারে হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় রবীন্দ্রনাথ বললেন— 'কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে এ আন্দোলনকে তিনি অধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। হিন্দু যদি বাঁচতে চায়, যদি সমাজে অধঃপতিত অবস্থায় চিরদিন পড়ে থাকতে না চায় তাহলে তাকে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে। কিন্তু হিন্দুদের এই সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা কি মুসলমান সন্দেহের চোখে দেখবে না আর তার ফলে হিন্দু মুসলমানের অমিলের আর একটা কারণ কি বৃদ্ধি পাবে না?" —এ প্রশ্নের জবাবে কবি বললেন— "হ্যাঁ তা হবে বৈ কি? কিন্তু সে বিপদের আশঙ্কা আমাদের মেনে নিতেই হবে। মুসলমানের যে স্বাধীনতায় আমরা বাধা দেইনি সে স্বাধীনতা আমাদেরও প্রাপ্য। তারা নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে, তারা ইচ্ছামতো হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে, আর তারা তা করতে এবং এখনো করছে—আমরা তো কখনো বাধা দিতে দাঁড়াইনি। আমরা যখন দিয়েছি তখন তারাই সে স্বাধীনতা কেন আমাদের দেবে না? আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইলে তারা কেন বাধা দেবে?" কবি তারপর শুদ্ধি ব্যাপারে সম্বন্ধে বললেন— তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না, মুসলমান যে স্বাধীনতার দাবি নিজেরা করছে, ঠিক সেই স্বাধীনতা অপরকে দিতে কেন নারাজ?

"কিন্তু"---কবি তারপর বললেন--- "হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করা কঠিন— যেসব বাধা বিপত্তি আছে তা অতিক্রম করা বড়ই শক্ত। সামাজিক ভেদনীতি হিন্দুকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দিচ্ছে।"

—তুষারকান্তি সরকার,
নেতাজী স্কোয়ার, কোচবিহার।

অশুভ জোট

২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচন। তারই প্রস্তুতি চলছে বিজেপি বিরোধী দলগুলির মধ্যে। সমস্ত নিয়ম, সততা, আদর্শ ও বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধুমাত্র বিজেপিকে ঠেকানোর জন্য এক কথায় দেশকে পিছিয়ে দেবার জন্য এক নীতিহীন জোট বাঁধতে চলেছে তারা। আর এক্ষেত্রে আগে পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখতে বা নাম পর্যন্ত যারা শুনতে পারত না তারাই এখন এক পাতে বসে প্রসাদ সেবন করছে। না, বিজেপিকে ঠেকাতে হবে। কিন্তু তা কতটা সম্ভব সেটা নির্বাচনের পরেই বোঝা যাবে। বা আদৌ জোট হবে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে প্রচুর। আর জোট যদিও বা হয় কে হবেন সেই জোটের নেতা বা নেত্রী তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। বাংলার নেত্রী মমতা ব্যানার্জি যিনি আবার বিরোধী জোটের স্রষ্টা, তাঁর সঙ্গে আবার রাহুল গান্ধীর সম্পর্ক সুমধুর নয়, অথচ মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখেন। কেন না অনেক অপেক্ষার পর কংগ্রেসের যুবরাজ এবার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সুতরাং একটা জগাখিচুড়ি জোট বামে ও ডানে মিলে হয়তো তৈরি হলেও হতে পারে, কিন্তু তা পাতে দেওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে রয়েছে হাজারো প্রশ্ন। আর যদি তৈরি হয় নিশ্চিত করে বলতে পারি ওই অশুভ জোট ভারতকে বেশ কয়েক যোজন পিছিয়ে দেবে।

—নরেশ মল্লিক,
পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান।

আকবরের হিন্দু প্রীতি!

ভারতের আক্রমণকারী মুসলমান রাজাদের মধ্যে আকবরের মহানুভবতা অস্বীকার্য। তাই তো ডক্টর ইশ্বরী প্রসাদ যথার্থই বলেছেন--- আকবর হয়তো হিন্দুদের ঔরঙ্গজেব হয়তো মুসলিমদের পক্ষপাতিত্ব করে থাকবেন। তবে শেরশাহ ছিলেন হিন্দু মুসলমান উভয়ের অনুরাগী। অনেক ঐতিহাসিক আকবরকে নির্ভেজাল হিন্দু ঘনিষ্ঠ বলে মত প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন আকবর সিন্ধুর অমরকোটে এক প্রভাবশালী হিন্দুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তার মধ্যে কিছুটা হিন্দুত্ব বোধ দেখতে পাওয়া যায়। জানি না তাদের কথা কতটুকু সত্যের মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছে। হ্যাঁ একথা সত্যি আকবর হিন্দুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া জিজিয়া কর উঠিয়ে দিয়েছিলেন। এটা প্রথম চালু করেছিলেন ফিরোজ শাহ তুঘলক। এবার আমরা আলোচনা করব আকবর কতটুকু হিন্দু ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। আকবর যখন মেবারের রাজধানী চিতোর দখল করেন, তখন চিতোর নগরীর ৩০ হাজার নিরীহ হিন্দু নরনারীকে হত্যা করা হয়েছিল। সেটা হয়েছিল মহান সম্রাট আকবরের আদেশে। আনারকলির জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়েছিল, সেটাও হয়েছিল আকবরের আদেশে। আকবর নিজে রাজপুত রমণীদের বিবাহ করেছিলেন। তার পুত্র জাহাঙ্গীরকেও রাজপুত রমণীর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। এছাড়া আকবরের মুসলমান সেনার সঙ্গে হিন্দু মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তার অধীনে যে গুটি কয়েক হিন্দু সেনাপতি ছিল তাদের কিন্তু মুসলমান রমণীর পাণিগ্রহণে সাহায্য করেননি। তিনি বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুকে ডেকে এনে ধর্ম আলোচনা শুনতেন। তার থেকে সার গ্রহণ করে এক নতুন ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। তার নাম দিন-ই-লাহি। তাতে বীরবল এবং তানসেন সেই ধর্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি হিন্দু রমণীদের সাধনার জন্য মন্দির করেছিলেন একথা সত্য। তাতে কি তারা হিন্দু হয়েছিল? এটা ছিল নাট্যশালার অভিনয় মাত্র। তার অধীনে হাতে গোনা দুই তিনটি সেনাদলের প্রধান ছিলেন হিন্দু। বাকি বেশির ভাগই ছিল মুসলমান। আকবরের হিন্দু প্রীতি ছিল শুধুমাত্র হিন্দুদেরকে এবং যোদ্ধা রাজপুত জাতিকে বশে রাখার কৌশল মাত্র। আকবর দূরদর্শিতার বশে হিন্দু আবেগকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। সেটা কতটুকু নিখাদ ছিল সেকথা বুদ্ধিমানিরাই বলতে পারেন।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

দুধের শুদ্ধতা বিচারের ভার মহিলাদেরই

সুতপা বসাক ভড়

মাংস নিয়ে আমরা অনেক দেরিতে সচেতন হয়েছি। এই সচেতনতা শুধুমাত্র মাংসের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন; কারণ কেবলমাত্র ব্যবসায়িক লাভের আশায় অসাধু ব্যবসায়ীরা আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। সুতরাং আমাদেরও সজাগ হতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান কিছু ঘরোয়া পদ্ধতিতেই বুঝে নিতে পারি। যেমন—দুধ।

ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে বেশিরভাগ দুধ উৎপাদন গ্রাম্য অঞ্চলে হয়ে থাকে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে দুধের উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। কিন্তু ক্রমবর্ধমান বিশাল জনসংখ্যার জন্য গত কয়েক বছর ধরেই চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হয়ে চলেছে। দুধের অত্যধিক চাহিদা এবং উপভোক্তাবাদী সংস্কৃতির কারণে ভারতের ব্যবসায়ীরা অসাধু হয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, বর্তমানে সিন্থেটিক দুধের উৎপাদন লাগামছাড়া ভাবে করা হচ্ছে। দুধে জল বা অন্য কিছু মেশানোর পরম্পরা নতুন কিছু নয়, তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নামকরণ অনুসারে মেশানো দুধ এবং সিন্থেটিক দুধ দুটি পৃথক তরল পদার্থ।

মেশানো দুধ বলতে শুদ্ধ দুধের মধ্যে স্নেহপদার্থের পরিমাণ কম করা, দুধ বেশিক্ষণ ভালো রাখার জন্য রাসায়নিক পদার্থ মেশানো, জল মেশানো ইত্যাদি বোঝায়। এখন দুধে জল মেশানো আছে কিনা, তা জানার জন্য কিছু ঘরোয়া উপায় আছে। যেমন, দুধে সরের পরিমাণ কম হওয়া মানেই জল মেশানো আছে। নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করতে হলে ল্যাক্টোমিটার ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনও মসৃণ সমতলে এক ফোঁটা দুধ ঢাললে যদি তা ধীরে ধীরে গড়িয়ে যায় এবং হালকা সাদা দাগ ছেড়ে যায়, তাহলে ওই দুধে কোনও জল নেই। দুধে সমপরিমাণ ৯৫ শতাংশ অ্যালকোহল মেশালে খারাপ দুধ কেটে যাবে। এছাড়া দুধে যদি ভুট্টার আটা অথবা স্টার্চ মেশানো থাকে, তবে ৫ শতাংশ তরল আয়োডিন মিশিয়ে গরম করলে দুধের রঙ নীল হয়ে যাবে।

সিন্থেটিক দুধ ডিটারজেন্ট, ইউরিয়া, কস্টিক সোডা, সাদা রঙ, চিনি, রিফাইন্ড তেল ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। এমনিতে সিন্থেটিক দুধ রং, স্বাদ এবং গন্ধ থেকে চিনে নেওয়া যায়, কিন্তু তাতে যদি শুদ্ধ দুধ মেশানো থাকে, তাহলে তা চেনা মুশকিল হয়ে যায়।

সহজে চেনা যায় না বলে সিন্থেটিক দুধ শুদ্ধ দুধ হিসাবে বাজারে ভালোই বিক্রি হয়ে থাকে। তবে ওই সিন্থেটিক দুধ বা তার থেকে তৈরি পদার্থ শরীরের পক্ষে ভীষণ হানিকর। নানারকম অসুখ যেমন হজমের গণ্ডগোল, বমি, পায়খানা, মাথাব্যথা, চর্মরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি সিন্থেটিক দুধ খেলে হতে পারে। বিশেষ করে শিশু, গর্ভবতী মহিলা, বয়স্ক এবং হার্টের রোগীর জন্য ওই দুধ মারাত্মক।

শুধু দুধে ৮৬ শতাংশ জল, ৪-৫ শতাংশ স্নেহ পদার্থ, ৮-৯ শতাংশ এস.এন.এফ (স্নেহ পদার্থ বাদ দিয়ে অন্যান্য কঠিন পদার্থ যেমন—প্রোটিন, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন, ল্যাকটোজ) থাকে। শুদ্ধ দুধের উপাদানগুলির সঙ্গে সিন্থেটিক দুধ মেশানো উপাদানগুলির তুলনা করলে দেখা যাবে যে, শুদ্ধ দুধের মধ্যে যে প্রাকৃতিক স্নেহ পদার্থ থাকে, সেগুলির স্থান নেয় সিন্থেটিক দুধের তেল। সেই রকম চিনি, ইউরিয়া ইত্যাদি এস. এন. এফ-এর মাত্রার স্থান নেয়। শুদ্ধ দুধ গরম পরিবেশে বেশিক্ষণ রাখলে টক হয়ে যায়। সেগুলি যাতে খারাপ না হয় সেজন্য অনেক সময় শুদ্ধ দুধে কস্টিক সোডা মেশানো হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকারের প্রিজারভেটিভ যেমন---হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, ফর্মালডিহাইড ইত্যাদি দুধকে বেশি সময় ভালো রাখার জন্য এবং কেটে যাওয়ার থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন যে, অজ্ঞানতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এই দুধ খেলে পেটের ক্ষত, অত্যধিক টেনশন, হৃদ্‌রোগ, শিশুদের শারীরিক বিকাশে বাধা ইত্যাদি হতে পারে।

সিন্থেটিক দুধ চেনার কিছু সহজ উপায় আছে। যেমন—সিন্থেটিক দুধ থেকে সাবানের মতো গন্ধ বেরোয়, নকল দুধ একটু তেঁতো স্বাদের হয়। সিন্থেটিক দুধে ডিটারজেন্ট মেশানো থাকার জন্য ফেনা এবং তৈলাক্ততা পরিষ্কার বোঝা যায়। আবার ঘরে রাখলে আসল দুধের রঙে বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় না, সিন্থেটিক দুধ একটু পরেই হলুদ হতে শুরু করে দেয়। নকল দুধ ফোটালে হলুদ হয়ে যায়। দুধ ফুটিয়ে ক্ষীর বানানোর ২-৩ ঘণ্টা পরেও যদি তাতে সর না পড়ে, তবে দুধ নষ্ট হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

সাধারণত দেখা যায় যে ভারতে বিভিন্ন পূজা-পার্বণে দুধ, ঘি, ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত পদার্থের চাহিদা সাধারণ দিনের থেকে বেড়ে যায়, সেই সময় প্রচুর পরিমাণে সিন্থেটিক দুধ বাজারে বিক্রি হয়। শুদ্ধ দুধ চিনে নেবার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মহিলারা খুবই দক্ষতার সঙ্গে করতে পারবেন। কারণ পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন থাকা তাঁদের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। সুতরাং, ভাগাড়ের মাংসের পরে অশুদ্ধ দুধ খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য মহিলারাই সবার আগে এগিয়ে আসা উচিত। ■

শরীর সচল রাখতে শশার বিকল্প নেই

রিংকী ব্যানার্জি

গ্রীষ্মকালে আমাদের দেহ থেকে ঘামের সঙ্গে জল বেরিয়ে যায়। তাই চিকিৎসকেরা শরীরে জলের ঘাটতি মেটাতে শশা, তরমুজ অর্থাৎ যেসব সবজি বা ফলে জলের পরিমাণ বেশি থাকে, সেইসব ফল খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে শশার কোনও বিকল্প নেই। যতই রাজকীয় ভোজনের আয়োজন করা হোক, তাতে থাকবেই স্যালাড। নিয়মিত শশা খেলে অনেক উপকার মেলে।

কনস্টিপেশনের প্রকোপ কমায় :

শশার ভেতর থাকে ফাইবার যা শরীরের ভেতরে বর্জ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো রোগের প্রকোপ সহজেই কমে যায়।

ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় :

বর্তমানে দেশের যা পরিস্থিতি তাতে সাবধানতা অবলম্বন না করলে চরম বিপদ। প্রতি বছর ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাই সেইসব খাবার খাওয়া উচিত যেগুলিতে মারণরোগ দূরে থাকে। এই কারণে শশা বাদ দেওয়া একেবারেই চলবে না। শশায় উপস্থিত উপাদান মানবদেহে ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।

শরীরে জলের অভাব পূরণ করে :

দেহের ভিতর জলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখাটা খুবই জরুরি। না হলে শরীর শুকিয়ে একাধিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তাই প্রতিদিন শশা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা। তাদের মতে, শশায় ৯৬ শতাংশ জল থাকে। যা খুব সহজেই শরীরে জলের অভাব পূরণ করে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়।

ত্বকের পরিচর্যায় :

শশায় উপস্থিত সিলিকা কোষে প্রবেশ করে কোষের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, ফলে ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। শশা খাওয়া শুরু করলে শরীরে থাকা টক্সিক উপাদান বেরিয়ে যায়। ফলে স্কিন টোনের দারুণ উন্নতি ঘটে।

ভিটামিনের ঘাটতি দূর হয় :

শশায় থাকে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ও সিলিকন। এইসব খনিজ শরীরের পাশাপাশি ত্বকেরও উন্নতি ঘটায়। তাই যদি সুন্দর ত্বক পেতে চান, আজ থেকেই শশা খেতে শুরু করুন।

পুষ্টির ঘাটতি দূর করে :

৩০০ গ্রাম শশায় ১১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২ গ্রাম প্রোটিন, ২ গ্রাম ফাইবার, দিনের চাহিদা প্রায় ১৪ শতাংশ ভিটামিন সি, ৬২ শতাংশ ভিটামিন কে থাকে। দিনের চাহিদার ম্যাগনেসিয়াম, ১৩ শতাংশ পটাসিয়াম, ১২ শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ। এই সবকটি উপাদানই আমাদের শরীরের গঠনেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে :

গরমে দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত শশা খাওয়াটা খুব জরুরি। কারণ শশা দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে সানস্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়। প্রচণ্ড রোদের তাপে ত্বক পুড়ে গেলেও শশা লাগানো যেতে পারে।

শরীরকে বিষমুক্ত করে :

শশার বিপুল পরিমাণ জল দেহের ভেতর প্রবেশ করা মাত্র টক্সিক উপাদান বের করে দেয়। শরীর হয় বিষমুক্ত।

ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে আনে :

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই ফলটির জুড়ি মেলা ভার। শশা শরীরের ভেতর অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে শুরু করে। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আসতে সময় লাগে না।

ওজন কমে :

ওজন বাড়ছে? আজই শশা খাওয়া শুরু করুন। দেখবেন উপকার মিলবে। কারণ, শশায় উপস্থিত বিশেষ কিছু উপাদান শরীরে মজুত চর্বি ঝরাতে সাহায্য করে। ■

চীনের ছদ্ম-সাম্রাজ্যবাদ বিপন্ন ছোট দেশগুলির সার্বভৌমত্ব

ড. কুণাল ঘোষ

আপাত দৃষ্টিতে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পের লক্ষ্য আশেপাশের অনুন্নত দেশগুলির পরিকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করা। কিন্তু এই প্রকল্পের এমন কিছু লক্ষণ রয়েছে যা ছোট দেশের পক্ষে ভয়ংকর। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের দিক থেকে চীন তার প্রতিবেশী দেশগুলির থেকে অনেকটাই এগিয়ে। ব্যতিক্রম দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান। কিন্তু আয়তন এবং জনসংখ্যার বিচারে দক্ষিণ কোরিয়া বা জাপানও চীনের ধারে কাছে আসে না। সুতরাং চীনের কাঁচামালের (মূলত তেল, গ্যাস এবং খনিজ আকরিক) চাহিদা বিপুল। চীনের হাতে উদ্বৃত্ত পুঁজি, বিনিয়োগযোগ্য প্রকল্প এবং উৎপাদিত পণ্যের বিপণনের জন্য বাজারের চাহিদাও বিশাল। এক সময় আমেরিকা ছিল চীনের ভোগ্যপণ্য বিক্রির সব থেকে বড়ো বাজার। ইদানীং আমেরিকা চীনা পণ্য বিক্রির ব্যাপারে কড়া মনোভাব নেওয়ায় চীন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির বাজার দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিন পিয়াং বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পের অবতারণা করেছেন।

চীনের কার্যকলাপ দেখে অনেকেরই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরোর কথা মনে পড়বে। তিনি বিখ্যাত তাঁর মনরো ডকট্রিনের জন্য। লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি থেকে ইউরোপীয় প্রভাব সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে তিনি সেখানে আমেরিকার একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। পরের দেড়শো বছর এইসব হতভাগ্য দেশ আমেরিকার অঙ্গুলিহেলনে চালিত একনায়কদের শাসন প্রত্যক্ষ করেছিল। যার সম্পূর্ণ সুযোগ নেয় আমেরিকার বেসরকারি কোম্পানিগুলো। মার্কিন সেনাবাহিনীর সাহায্যে তারা লাতিন আমেরিকার বাজারে এবং খনিজ সম্পদে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে। বিংশ শতাব্দীতে চিলির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট অ্যালেন্দেঁর অপসারণ এবং হত্যাকাণ্ডের পর শেষ হয় সেই অন্ধকার যুগ। চীন যদিও অন্য কোনও দেশে এরকম বিশেষ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কথা বলছে না এবং সেটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণও। কিন্তু যখন দেখা যায় চীন বিভিন্ন দেশে তার নাগরিকদের জন্য ছোটো ছোটো কলোনি স্থাপন করছে তখন বিষয়টা জটিল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে এক ভয়ংকর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়।

শ্রীলঙ্কা :

শ্রীলঙ্কার হামবানতোতা বন্দর-পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পটিকে বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পের ট্রায়াল বলা যেতে পারে। কলম্বোর বিকল্প হিসেবে হামবানতোতায় অত্যাধুনিক বন্দর নির্মাণের জন্য চীন শ্রীলঙ্কাকে বিশাল অঙ্কের টাকা ঋণ দিয়েছিল। সুদের হার ছিল বেশ চড়া। ঋণ শোধ করতে গিয়ে শ্রীলঙ্কা আবিষ্কার করল তারা ঋণের ফাঁদে পড়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তারা শোধ করতে পারেনি।

এরপরই চীন প্রায় জোর করে ৯৯ বছরের লিজে হামবানতোতা বন্দর এবং তার আশপাশের অঞ্চলের দখল নেয়। দখলদারি কার্যকর হয় ২০১৭-র ডিসেম্বরে।

সাধারণভাবে প্রকল্পের খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। ঋণের পরিমাণ ইচ্ছে করেই বেশি রাখা হয়েছিল। শ্রীলঙ্কার ঋণের ফাঁদে পড়ার আর একটি কারণ দূরদৃষ্টির অভাব এবং লোভ। লিজ নেবার পর চীন ইতিমধ্যেই শ্রমিক, প্রযুক্তিবিদ, সাধারণ কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার এবং সর্বস্তরের আমলার একটি বিশাল দল এনে হাজির করেছে। তাদের জন্য বাসস্থান তৈরির কাজও শেষ। আগামী ৯৯ বছর শ্রীলঙ্কার জমি নিজের দখলে রাখার জন্য চীন তৈরি। পরিকাঠামো উন্নয়নের এত ভালো উদাহরণ বেশি পাওয়া যায় না। ৯৯ বছর পর শ্রীলঙ্কা তার জমি ফেরত পাবে কিনা সেটাই এখন লক্ষ টাকার প্রশ্ন। হামবানতোতার অদূরে চীন একটি কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করেছে। এখন চীনের লক্ষ্য দ্বীপটিকে বিনোদন এবং পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীলঙ্কা এই প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। চীনও দেরি না করে ঋণের শেষ কিস্তির ৫৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আটকে দিয়েছে। শ্রীলঙ্কার বন্দর কর্তৃপক্ষের যুক্তি, যেহেতু এটি একটি পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প তাই এর সুবিধাগুলি বন্দর-সম্পর্কিত হওয়া জরুরি। বিনোদন বা পর্যটন কোনওভাবেই পরিকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে পড়ে না। স্থায়ীভাবে না হলেও সাময়িক ভাবে শ্রীলঙ্কা তার সার্বভৌমত্ব হামবানতোতা বন্দরের ওপর থেকে হারিয়ে ফেলেছে। শ্রীলঙ্কার দিক থেকে এটাই এখন সবচেয়ে কঠিন সত্য।

প্রসঙ্গ : সার্বভৌমত্ব

ভারত যাতে বেল্ট অ্যান্ড রোডকে কার্যকরী করতে সমর্থন করে তার জন্য চীন অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছে। সম্প্রতি সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশনের (এস সি ও) পূর্ণ সদস্যপদ দিয়ে চীন ভারতের প্রতি বাড়তি গুরুত্ব দেখিয়েছে। যদিও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পুরনো নীতি থেকে সরেননি। পরিষ্কার বলে দিয়েছেন বেল্ট অ্যান্ড রোড এবং চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর— এই দুটি প্রকল্পই ভারতের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। প্রকল্পের সমর্থক হওয়া তো দূরের কথা, ভারত ইতিমধ্যেই বেল্ট অ্যান্ড রোডের বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার শুরু করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, শ্রীলঙ্কার হামবোনতোতা বন্দর চীনের লিজ নেওয়া এবং সেই অজুহাতে কলোনি বানানোর ঘটনাও যে ভারতের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক তাই নিয়েও সরব হয়েছে ভারত। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরেও এখন চীনের লাল ফৌজের দাপাদাপি। বেলুচিস্তানের গদরে চীনের উদ্যোগে চলছে বন্দর তৈরির কাজ। সেখানেও মোটামুটি একই ছবি। প্রকল্পের কাজ দেখার অছিলায় চীনের নাগরিকরা কলোনি তৈরি করে বসবাস করছেন।

মায়ানমার :

চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তানের গদর এবং উত্তর-পশ্চিম চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের কাশগর বন্দরটিকে যুক্ত করা। বন্দর সংযুক্তিকরণের আরও একটি প্রস্তাব প্রকল্পের অন্তর্গত। সেটি হলো মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের কিয়াপকিউ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের কুনমিং বন্দরদুটিকে সড়কপথে যুক্ত করা। এই দুটি বন্দর শহর ইতিমধ্যেই তেল ও গ্যাসের পাইপলাইনের মাধ্যমে সংযুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিয়াপকিউ একটি প্রাচীন বন্দর এবং অত্যাধুনিক পরিকাঠামোর অভাবে মৃতপ্রায়। চীন এবং মায়ানমার দুই দেশই বন্দরের আধুনিকীকরণে আগ্রহী। এই প্রকল্পকে চীন মায়ানমার ইকোনমিক করিডোর বলা যেতে পারে, যা চীনকে সরাসরি বঙ্গোপসাগরের দখল নেবার মতো জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। তারপর সেখান থেকে ভারত মহাসাগর। আবার মায়ানমারের দিক থেকে ভাবলে কিয়াপকিউ বন্দরটি অত্যাধুনিক পরিকাঠামোয় সমৃদ্ধ হয়ে উঠলে ইয়াংগন বন্দরের চাপ অনেকটাই কমবে।

কিন্তু কাপ আর ঠোঁটের মাঝে সবসময়েই কিছুটা ফাঁক থেকে যায়। মায়ানমারকে এখন প্রকল্পটি নিয়ে অন্যভাবে চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে। সাংবাদিক জন রিড লিখেছেন, 'চীনা সাহায্যে নির্মীয়মাণ ৯ বিলিয়ন ডলারের বন্দর প্রকল্পে অত্যধিক খরচ নিয়ে মায়ানমার চিন্তিত।' অস্ট্রেলিয়ার লেখক সাংবাদিক শঁ টার্নওয়েলও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'প্রকল্পের কাজ শেষ হলে মায়ানমারের যে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ না থাকলেও এই প্রকল্পের খরচ সাংঘাতিক বেশি।' মায়ানমারের জিডিপি খুবই কম। চীনের কাছ থেকে ঋণ নিলে জিডিপি-র ওপর ৩ শতাংশ বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে। মায়ানমার তা শোধ করতে পারবে না বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সেক্ষেত্রে কিয়াপকিউও হামবানতোতার মতো ৯৯ বছরের লিজে চীনের দখলে চলে যাবে। তারপর শুরু হবে কলোনি তৈরি করা।

চীন আদপেই বিগত দিনের সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সোভিয়েতও ঋণ দিত। সেইসঙ্গে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞ সবই সরবরাহ করত তারা। কিন্তু কখনই তারা চীনের মতো নিজের দেশের মিস্ত্রিমজুর পাঠাত না। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা স্ত্রীদের সঙ্গে আনতেন না। থাকতেন বিলাসবহুল হোটেলে। কম জনসংখ্যার দেশ হবার ফলে বিদেশে কলোনি স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা সোভিয়েতের ছিল না। কিন্তু চীন একেবারে মাটি কাটার লোক থেকে শুরু করে প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক নিজের দেশ থেকে নিয়ে আসে। এর মাধ্যমে চীনে কর্মসংস্থানের সমস্যার অনেকটাই সুরাহা হয়। তাছাড়া কলোনি তৈরি করে শ্রমিককর্মীদের সেখানে রাখার ফলে জনসংখ্যার চাপও কিছুটা কমে। এরপর চীন অনুন্নত দেশের অভাব এবং প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে বিপুল ঋণ (সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে) দেবার প্রস্তাব করে। সুকৌশলে প্রকল্পের খরচ বাড়িয়ে দেয়। ধীরে ধীরে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে ছোটো ছোটো দেশগুলো।

মায়ানমার এখন প্রকল্পের খরচ কম করার জন্য চীনের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছে। যদিও এই আলোচনা করার ব্যাপারটা খুব সহজ হবে না। কারণ ২০১১ সালে চীনের প্রস্তাবিত মিটসোন ড্যাম (খরচ ১.৫ বিলিয়ন ডলার) প্রকল্পটি মায়ানমার পরিবেশ দূষণের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন থেকেই চীন মায়ানমারের ওপর ক্ষুব্ধ। চুক্তি অনুযায়ী ড্যামটি তৈরি হলে যে জলবিদ্যুৎ তৈরি হতো তাতে উপকৃত হতো মায়ানমার। অবশ্য বিদ্যুতের একটা বড় অংশ চলে যেত চীনের ইউনান প্রদেশে, বাধ্যতামূলকভাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মায়ানমারের উত্তরাংশ সন্ত্রাসবাদী অধ্যুষিত। চীন প্রায়ই মায়ানমার সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এদের ব্যবহার করে। তাছাড়া, মায়ানমারের উত্তরে যেসব ছোটো ছোটো শহর আছে সেখানে চীনা নাগরিকদের সংখ্যা চোখে

পড়ার মতো। এরা মূলত ব্যবসায়ী। তবে এরা ব্যবসায়িক লেনদেনে মায়ানমারের মুদ্রা ব্যবহার না করে চীনা ইউনান ব্যবহার করে। একই দেশে দু'রকম মুদ্রা ব্যবহার কীভাবে চলতে পারে তা বুদ্ধির অগম্য।

কম্বোডিয়া :

জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য কম্বোডিয়া ইতিমধ্যেই দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের একটা বড়ো অংশ চীনের তিয়ানজিন ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট গ্রুপের (ইউ ডি জি) কাছে ৯৯ বছরের জন্য লিজ দিয়েছে। প্রকল্পের নাম কো কোং প্রকল্প। কম্বোডিয়ার ২০ শতাংশ উপকূলবর্তী অঞ্চল এখন চীনের দখলে। যার জন্য প্রতি হেক্টরে চীনকে খরচ করতে হয়েছে মাত্র ৩০ ডলার। তাছাড়া একটি অভয়ারণ্যও চলে গেছে প্রকল্পের আওতায়। দেশের বিশিষ্ট পরিবেশবিদেরা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এ ব্যাপারে আপত্তি জানায়। কিন্তু কম্বোডিয়ার রাজা ডিক্রি জারি করে আদেশ বহাল রেখেছেন। প্রকল্পের কাজ দেখাশোনা করার জন্য চীন এখন বিপুল সংখ্যায় শ্রমিক আনছে দেশ থেকে (সূত্র : আ চাইনিজ কলোনি টেকস শেপ ইন কম্বোডিয়া, লেখক অ্যানড্রিউ নাচেমসন)। ২১১৫ সালে যখন লিজের মেয়াদ শেষ হবে তখন এই কলোনির চেহারা কী দাঁড়াবে এখন থেকে বলা মুশকিল।

তাজিকিস্তান :

'তাজিকিস্তান তার নিজের জমি চীনের হাতে তুলে দিচ্ছে।' খবরটি বেরিয়েছিল বিবিসি-র এশিয়া-প্যাসিফিক জার্নালে, তারিখ ছিল ২০১১ সালের ১৩ জানুয়ারি। পামির পার্বত্যাঞ্চল সংলগ্ন ১০০০ স্কোয়ার কিলোমিটার জমি তাজিকিস্তান চীনের হাতে তুলে দিয়েছে। উল্লেখ্য, তাজিকিস্তানের অর্থনীতিতে চীন বৃহত্তম বিনিয়োগকারী। বিনিয়োগের বেশিরভাগই করা হয় শক্তি ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে। চীন এবং তাজিকিস্তানের মুখপাত্ররা সাফাই দিয়েছেন, 'একটি পুরনো সীমান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য জমির লেনদেন হয়েছে।' কিন্তু তাজিকিস্তানের এক বিরোধী নেতার কথায়, 'এই হস্তান্তর দেশের গণতন্ত্রের পরাজয় এবং সংবিধানের অবমাননা।' একথা ঠিক আফগানিস্তানে চলতে থাকা গৃহযুদ্ধের আঁচ সবসময়েই তাজিকিস্তানের গায়ে লাগে। মাঝে মাঝেই সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়। এই অবস্থায় এরকম একটি হতদরিদ্র এবং সন্ত্রাসবাদে দীর্ণ দেশের জমি হাতিয়ে নেওয়া কি চীনের পক্ষে কী খুব জরুরি ছিল? চীনের যুক্তি বাণিজ্যের প্রয়োজনেই জমি নেওয়া হয়েছে এবং কলোনি গড়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কথা মনে পড়তে বাধ্য। তারাও একই যুক্তি দেখিয়েছিল। সুতরাং চীনের মতো একটি দেশকে বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া উচিত কিনা ভারতেরও ভাবা দরকার। কারণ চীনের উদ্দেশ্য মোটেও সাধু নয়।

লাওস :

চীনের কুনমিং থেকে থাইল্যান্ডের লাওস পর্যন্ত একটি হাইওয়ে আছে। লাওস-চীন সীমান্ত থেকে শুরু করে কুনমিং-লাওস হাইওয়ের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে ১৬৪০ হেক্টর জমি চীনকে ৩০ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে। বোটেন গোল্ডেন সিটি প্রকল্পের কাজের জন্য এই পদক্ষেপ। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন আছে, তেমনি রয়েছে হোটেল, ক্যাসিনো এবং শপিং কমপ্লেক্স তৈরির পরিকল্পনা। প্রকল্পের দায়িত্ব ফোক হিং কোম্পানির। লাওস সরকার কোম্পানির কাছ থেকে বছরে ২ মিলিয়ন ডলার করে পায়। কিন্তু সমস্যা সেখানে নয়। কুনমিং-লাওস হাইওয়ের আশেপাশে এবং লাওসের উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলি যেমন উদুমজে, লুয়াং নামথা এবং বোকিওতে চীন থেকে কাজের জন্য আসা লোকের ভিড় বাড়ছে। স্বাভাবিক ভাবেই লাওস সরকার উদ্বিগ্ন। যদিও চীন এখনও পর্যন্ত লাওসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলায়নি। কিন্তু গলাতে যে পারে তার প্রমাণ মিলেছে কয়েকটি ঘটনায়।

অবশ্যই চীন ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করেনি। বাণিজ্যের কথা চীনা নেতাদের মুখে ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু ঊনিশ শতকে যেমন ইউরোপিয়ানরা এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলিকে 'সভ্য' করে তোলার যুক্তি দেখিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করত, চীন ঠিক তেমনই পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক করার অজুহাতে উপনিবেশ স্থাপন করতে চাইছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সুতরাং ছোটো দেশগুলি তো বটেই, ভারতেরও সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। ■

(সৌজন্য : নিউজ ভারতী নিউজ পোর্টাল)

ভারতে খ্রিস্টান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতার প্রকৃত স্বরূপ

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ খেতড়ি নিবাসী পণ্ডিত শঙ্করলালকে একটা চিঠিতে লিখছেন, ‘‘এখন এই পাদরিরা দক্ষিণে কী করিতেছে, দেখিবেন— আসুন দেখি। উহারা লাখ লাখ নীচ জাতকে খ্রিস্টান করিয়া ফেলিতেছে— আর পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের সর্বাপেক্ষা যেখানে বেশি, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী এবং স্ত্রীলোকেরা--- এমনকী রাজবংশীয় মহিলাগণ পর্যন্ত --- ব্রাহ্মণগণের উপপত্নীরূপে বাস করা খুব সম্মানের বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকে, তথাকার সিকিভাগ খ্রিস্টান হইয়া গিয়াছে।’’

শতাধিক বছর আগে স্বামীজী পত্র মারফত যে উদ্বেগ এবং দুর্ভাবনার কথা প্রকাশ করেছিলেন আজ বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর বুকে দাঁড়িয়ে যখন কেন্দ্রে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোট সরকারের শাসন চলছে তখনও অবস্থার ইতরবিশেষ হয়নি। যখন দিল্লি ও গোয়ার আর্চবিশপরা খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের ‘নিরাপত্তা’র অভাব বোধ করে বিবৃতি দান করছেন, তখন অন্যদিকে দক্ষিণ ভারত-ভিত্তিক খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থা তাদের মুখপত্রে বুক ফুলিয়ে কী লিখছে দেখুন, ‘We are fulfilling the work of sending 500 village missioneries to preach the gospel across all villages in Tamil Nadu. GOD has given us the grace to dedicate and send out 150 missioneries so far. We have to send out 350 missioneries very soon. Please pray for GOD to rise up childern of GOD and support a missionary by giving Rs. 1000/- every month.’

এর অর্থ সহজ সরল গ্রাম্য মানুষগুলিকে কখনো বুঝিয়ে, কখনো প্রলোভন দেখিয়ে, প্রয়োজন হলে ভয় দেখিয়ে খ্রিস্ট ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা। ভারতবর্ষে কোনও শক্তিশালী ধর্মান্তরকরণ বিরোধী আইন না থাকার ফলে এই সমস্ত খ্রিস্টান পাদরিগণ অনায়াসে এবং অবাধে ধর্মান্তরণ করে থাকে।

এর উপর তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি সংকীর্ণ ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থে এই বিষয়ে অন্ধ ও বধির থাকাকেই শ্রেয়স্কর মনে করে। ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচাইতে সহজলভ্য হিন্দু সমাজ তারই ধর্মান্তরকরণের জন্য সেই আবহমানকাল থেকেই মূল লক্ষ্য বস্তু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই বিষয়ে অনেক সাধুসন্ত মনীষী আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন হিন্দুসমাজ থেকে বহির্গমনের প্রচেষ্টাকে রুখতে। স্বামীজী বলেছিলেন— ‘হিন্দুধর্ম থেকে একজন বেরিয়ে যাওয়ার অর্থ শুধু একজন হিন্দুর সংখ্যা কমে যাওয়াই নয়। একজন হিন্দুর শত্রুর সংখ্যাও বৃদ্ধি হওয়া।’

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীও সখেদে বলেছিলেন, ‘অবিরত অত্যাচার উৎপীড়নে হিন্দুর জাতীয় জীবন ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু, হিন্দু জাতির সে আঘাতের প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ কৈ? আত্মরক্ষা, ন্যায্য স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা— মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও দাবি।’

অন্ধ্র প্রদেশের কুডাপ্পা জেলার কোলিঙ্গপল্লী গ্রাম সেক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম বলা যায়। খ্রিস্টান পাদরিরা সেই গ্রামের

খ্রিস্টান মিশনারিরা যেরকম প্রায় বিনা বাধায় একটা হিন্দু প্রধান দেশে সেই ধর্মের লোকজনকেই ধর্মান্তরিত করবার জন্য প্ররোচিত করছে; যদি তাঁরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরান, ইরাক, সৌদি আরবে গিয়ে ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরকরণ কার্যসূচি আরম্ভ করে তাহলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর নিরাপত্তাবোধ বলতে কী বোঝায় তা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

কয়েকজনকে ধর্মান্তরিত করে। ফলে গ্রামের মানুষজনের মধ্যে প্রবল আলোড়ন ওঠে। তারা স্থানীয় পঞ্চায়েতে সভা করে স্থির করে যে এর একটা প্রতিকার করতে হবে। তারা গ্রামের দুটি প্রধান প্রবেশ পথের ধারে দুটি নোটিশ বোর্ড স্থাপন করে। সেই নোটিশ বোর্ডে লেখা হয় 'ধর্ম আমাদের মায়ের মতো। ধর্ম পাল্টানোর অর্থ মাকে পাল্টানো। আমরা তা হতে দিতে পারি না। এখানে সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষ স্বাগত। কিন্তু সেই সুযোগে কেউ যদি ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা করেন তাহলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।'

এরপর ১৫০০টি গীতাগ্রন্থ গ্রামের মানুষজনের মধ্যে বিতরণ করা হয়। গ্রামে গোমাতার পূজা করা হয়। তারপর সমস্ত গ্রামবাসী এক জায়গায় বসে পংক্তি ভোজনে অংশগ্রহণ করে। এইভাবে শুধু সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করাই নয়, নিজেদের মধ্যে সহমর্মিতা ও ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। এই দৃষ্টান্ত দেখে আশপাশের কয়েকটি গ্রামও অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এখন এই সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যাজকগণ কেন নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন এবং সরকার পরিবর্তনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তা বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। যদি কেন্দ্রে একটি জাতীয়বাদী সরকারের পরিবর্তে ভ্যাটিকানের প্রতি আনুগত্যপ্রদানকারী কোনও রাজনৈতিক দল ক্ষমতা দখল করে, তাহলে এই সনাতন ধর্মাবলম্বী ভারতবর্ষকে পদানত করে আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলির মতো একটি খ্রিস্টান দেশে পরিণত করা সহজসাধ্য হবে। এই হাজার হাজার বছরের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি চিরকালের মতো পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সাধারণ ভারতবাসী তা কি সহজে মেনে নেবে?

ঋষি অরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণে বলেছিলেন, শুধু ভারতবর্ষের জন্যই নয়, বিশ্বসভ্যতার জন্য এই সনাতন হিন্দু ধর্মের উত্থান প্রয়োজন। যদি এই সনাতন ধর্ম ধ্বংস হয় তাহলে বিশ্বসভ্যতাও ধ্বংস হবে।

যে ধর্ম ও সংস্কৃতি হাজার হাজার বছর ধরে নানা ঝড়ঝাপটা সহ্য করেও তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, সে শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেনি, বিশ্বের নানা প্রান্তের নির্যাতিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের আশ্রয় দিয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বে মানবতার বাণী প্রচার করে চলেছে। তাই এই ধর্ম ও সংস্কৃতিকে শুধু সংরক্ষণই নয় তার প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য। অন্যদিকে যদি এই খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপ দেখা যায় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, কোটি কোটি ডলারে পুষ্ট হয়ে তারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে পদানত করে সেইসব দেশগুলির নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। সেই ফর্মুলায় ভারতবর্ষও তাদের এই পরিকল্পনার বাইরে নয়। তাদের মদতপুষ্ট বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিদেশি অর্থ সাহায্যে সমৃদ্ধ হয়ে দেশের স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করতে উদ্যত। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই বিদেশি অর্থ সাহায্যের সাপ্লাই লাইনটা কেটে দিয়েছে। তারপর থেকেই শুরু হয়ে গেছে তাদের 'নিরাপত্তার অভাব' বোধ করা।

তাই তাদের মুখপত্রে লেখা হচ্ছে, 'If we pray like this, our Lord GOD will do exactly what we have asked for. That is what written in the word of god. During the revival time this is usually happens. Village by village, city by city, thousands and thousands of young people will ripe up and preach about Jesus Christ. The Government will be confused. There will be dilema who to arrest and who to intimidate. All the churches will rise up to do ministry. People will be zealous to preach the gospel.' (যদি আমরা এই ভাবে প্রার্থনা করি তাহলে আমরা যা চাই ভগবান সেইরকমই করবে। ভগবানের বাণীতে তাই লেখা আছে। পুনরুত্থানের সময় সাধারণত এইসব ঘটে। গ্রামের পর গ্রাম। শহরের পর শহর, হাজার হাজার যুবকেরা জেগে উঠবে এবং যিশুখ্রিস্টের সম্বন্ধে প্রচার করবে। সরকার হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাববে কাকে গ্রেপ্তার করবে আর কাকেই বা ভয় দেখাবে। সমস্ত গীর্জাগুলি ধর্মীয় কার্যকলাপ শুরু করার জন্য জেগে উঠবে। জনগণ ঈর্ষণীয় ভাবে প্রভুর বাণী প্রচার করবে।)

এটাই হচ্ছে তীব্র ধর্মীয় মেরুকরণ এবং মৌলবাদী চিন্তার উদাহরণ। কোনও দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি বেড়ে ওঠে সেই দেশের আবহাওয়া এবং দেশবাসীর স্বভাব-প্রকৃতির উপর। ভারতবর্ষের বহুমাত্রিক চরিত্র এবং বর্ণময় প্রেক্ষাপটে সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি স্থায়িত্ব লাভ করেছে। এই বহুত্ববাদই তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অথচ তারই মধ্যে ঐক্যের ওঙ্কারধ্বনি স্পন্দিত হয়ে চলেছে। আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্র ও পুরাণে সেই কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। বিভিন্ন সাধু-সন্ত-মনীষীর ব্যাখ্যায় এবং লেখনীতে তা ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়ে এক অনুপম সৌধের আকার ধারণ করেছে। হাজার হাজার বছর ধরে বহে চলা এই সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোতকে রুদ্ধ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। ঈশ্বরের একান্ত আপন দেশে এইভাবেই চলবে। স্বামীজীর অনুপম ভাষায় 'এদেশে মা কালী চিরকাল পাঁঠা খাবে। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাবে, বুড়ো শিব ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াবে। এ যদি পছন্দ না হয় তবে সরে পড় না কেন।'

আজ এই খ্রিস্টান মিশনারিরা যেরকম প্রায় বিনা বাধায় একটা হিন্দু প্রধান দেশে সেই ধর্মের লোকজনকেই ধর্মান্তরিত করবার জন্য প্ররোচিত করছে; যদি তাঁরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরান, ইরাক, সৌদি আরবে গিয়ে ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরকরণ কার্যসূচি আরম্ভ করে তাহলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর নিরাপত্তাবোধ বলতে কী বোঝায় তা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র :

(১) পত্রবাসী— (উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত)— ৫৬ পৃ.।

(২) Jesus redeems–June, 2018.

(৩) Organiser (June 17, 2018).

(৪) শ্রীশ্রীযুগাচার্য জীবনচরিত— স্বামী বেদানন্দ।

এই সময়

অন্নদাতা

আমি জানি আপনারা বছরের পর বছর মাত্র দশ শতাংশ লাভে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য

হয়েছেন। এও জানি, এর জন্য দায়ী কে? কৃষকেরা আমাদের দেশের আত্মা, অন্নদাতা। অথচ কংগ্রেস চিরকাল কৃষকদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছে। এ কথা বলেন নরেন্দ্র মোদী। কিষান কল্যাণ র‍্যালির মঞ্চে।

ষষ্ঠ বৃহত্তম

ভারতীয় অর্থনীতি একলাফে অনেকদূর এগিয়ে গেল। ফ্রান্সকে পিছনে ফেলে ভারত এখন ষষ্ঠ

বৃহত্তম অর্থনীতি। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে পাওয়া গেছে এই তথ্য। রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছর ভারতের জিডিপি ছিল ২.৫৯৭ ট্রিলিয়ন ডলার।

ধরোহর

ধরোহর কথাটির অর্থ ধারক এবং বাহক। আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার দিল্লিস্থ

হেডকোয়ার্টারের নাম রাখা হয়েছে ধরোহর ভবন। সম্প্রতি ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভাষণে তিনি ভারতের ইতিহাস এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পরম্পরার কথা উল্লেখ করেন।

সমাবেশ -সমাচার

মাথাভাঙায় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রশিক্ষণ শিবির

গত ২০ থেকে ২৬ জুন কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা সরস্বতী শিশু মন্দিরে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৭৮ জন সেবিকা অংশগ্রহণ করেন।

শিবির অধিকারী হিসেবে বর্ণালী অধিকারী এবং কার্যবাহিকা রূপে উপস্থিত ছিলেন নন্দিতা বর্মণ। ৫ জন শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ দানের জন্য ছিলেন। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহিকা শ্রীমতী মহুয়া ধর শিবিরে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন।

সূর্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন

গত ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিশিষ্ট সামাজিক সংগঠন সূর্য ফাউন্ডেশন এবং ইন্টারন্যাশনাল ন্যাচরোপ্যাথি অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে সারা দেশে ২৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৭৭ জন যোগ অনুশীলন করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলা। সেখানে ২৫৬০ স্থানে

১০ লক্ষের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এই যোগ অভিযানকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও আয়ুষমন্ত্রী শ্রীপাদ নাইক। ইন্টারন্যাশনাল ন্যাচরোপ্যাথি অর্গানাইজেশনের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ তথা যোগ অভিযানের সঞ্চালক ড. অনন্ত বিরাদার কোথাও না কোথাও যোগ অনুশীলনে অংশ নেওয়ার জন্য দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানান।

এই সময়

শ্রীরামায়ণ এক্সপ্রেস

রামায়ণে বর্ণিত তীর্থস্থানগুলিকে একসূত্রে বাঁধার জন্য ভারতীয় রেল একটি বিশেষ ট্রেন

চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নাম শ্রীরামায়ণ এক্সপ্রেস। ট্রেনটির যাত্রা শুরু হবে রামের জন্মস্থান অযোধ্যা থেকে। শেষ হবে কলোম্বোয়, যেখানে সীতা রাবণের অশোকবনে বন্দি ছিলেন।

পল্লীবাসিনী

'মেয়েরা এখন সবক্ষেত্রে তাদের প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে। তাই অল্পবয়েসেই প্রতিভা

চিহ্নিত করে তাদের সঠিক সুযোগ দেওয়া খুবই জরুরি'— বক্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেল্ফ হেল্প গ্রুপের একটি অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। গ্রামের মেয়েদের প্রতিভার বিকাশে তিনি জোর দেন।

হিমা দাস

আঠারো বছরের হিমা দাস কুড়ি বছরের কম বয়েসিদের আই এ এ এফ বিশ্ব প্রতিযোগিতায়

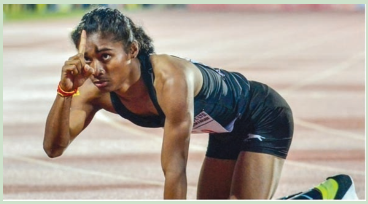

সোনা জিতেছেন। প্রতিযোগিতার আসর বসেছে দক্ষিণ ফিনল্যান্ডের ট্যামপেরেতে। সেমি ফাইনালে হিমা মাত্র ৫২.১০ সেকেন্ডে লক্ষ্যে পৌঁছে যান।

সমাবেশ -সমাচার

কলকাতার বড়বাজার লাইব্রেরির উদ্যোগে ভঁওয়রলাল মল্লাবত ব্যাখ্যানমালা

'সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেশকে ভাঙার যে চক্রান্ত চলছে তা কখনও সফল হবে না। ভারত চিরন্তন রাষ্ট্র। আমাদের হাজার বছরের স্বর্ণিম ইতিহাস

রয়েছে। যখন অন্য জাতি সভ্যতার মুখ দেখেনি তখন ভারতবর্ষ পূর্ণ বিকশিত। ৬ হাজার বছর আগে আমাদের এখানে নগর সভ্যতার পত্তন হয়েছে। তখন ব্যবসা, শিল্প, বন্দরে সব কিছু ছিল।' কলকাতায় বড়বাজার লাইব্রেরির উদ্যোগে গত ৮ জুলাই কর্মযোগী ভঁয়রলাল মল্লাবত স্মরণে ২২তম ব্যাখ্যানমালায় একথাগুলি বলেন মুম্বইয়ের প্রখ্যাত চিন্তক রতন সারদা। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রভাত জৈন 'পূজ্য মাঁ কী অর্চনা মেঁ ম্যাঁয় এক ছোটা উপকরণ হুঁ' গীত পরিবেশন করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন লাইব্রেরির অধ্যক্ষ মহাবীর বাজাজ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে রতন সারদা রচিত RSS 369º Demystifying Rashtriya Swayamsevak Sangh' পুস্তক প্রকাশ করেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অশোক গুপ্তা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রঞ্জিত আগরওয়াল। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়ার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়া তাজপুরে শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব কালচারের উদ্যোগে শ্যামাপ্রসাদ জন্মজয়ন্তী

গত ৬ জুলাই হাওড়া জেলার তাজপুরে শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব কালচারের উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অখণ্ড ভারতের অমর পূজারি, জাতীয় ঐক্য-সংহতির প্রতীক, ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১১৮তম শুভ জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। শুরুতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকপ্রিয়

এই সময়

আচ্ছে দিন

ভারতের বন্দরগুলির আর্থিক বৃদ্ধি ঘটেছে ৩.৯১ শতাংশ। চলতি আর্থিক বর্ষে (এপ্রিল

থেকে জুন পর্যন্ত) ভারতীয় বন্দরগুলিতে মোট ১৭৪.০২ মিলিয়ন টন পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়েছে। কামারাজার বন্দর রয়েছে তালিকার শীর্ষে। গত বছর আমদানি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৬৭.৪৮ মিলিয়ন টন।

গণপাঠ

মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের উদ্যোগে সম্প্রতি অযোধ্যায় হয়ে গেল গণ কোরান পাঠ। কোরান

পড়ার জন্য প্রায় পনেরোশো ইসলামিক গবেষক, মৌলবি সরযুর তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক রাজা রিজভি বলেন, গণপাঠের মাধ্যমে মুসলমান ভাইয়েরা রামমন্দির যাতে নির্বিঘ্নে তৈরি করা যায় তার বার্তা দিয়ে গেলেন।

গুলাব সিংহ

পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের অবস্থা শোচনীয়। সম্প্রতি সে দেশের প্রথম শিখ পুলিশ অফিসার

গুলাব সিংহ ও তার পরিবারকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর অপরাধ তিনি সৈয়দ আসিফ আখতার হাসমি নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন।

জননেতা প্রসাদ চক্রবর্তীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যার্পণ পর করা হয়। পরে প্রসাদতীর্থ সভাগৃহের সমবেশে ড. মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণের তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে মনোগ্রাহী আলোচনা করেন নন্দলাল মণ্ডল ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পৃথ্বীশকুমার সামন্ত। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বর্ষব্যাপী বৃক্ষরোপণের সূচনা স্বরূপ কয়েকটি চারা গাছ রোপণ করা হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে সংস্থা দীর্ঘ ৩৪ বৎসর এই দিনটিকে স্বেচ্ছা রক্তদানের জন্য চিহ্নিত করে ধারাবাহিক ভাবে রক্তদান করে চলেছে। ১৫ জন মহিলাসহ ৬৫ জন রক্তদান করেন। উল্লেখ্য, এই শিবির হতে সংগৃহীত রক্ত ৫ জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসায় ব্যয়িত হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক দয়ানন্দ চৌধুরী, তাজপুর এস. এন. রায় ইন্সটিটিউশনের ভার প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাবুল ভৌমিক, অমরাগোড়ী বি.বি.ধর গ্রামীণ হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুকান্ত বিশ্বাস ও রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি সুকান্ত পাল। বৈকালিক অনুষ্ঠানে প্রসাদ স্মৃতি সরস্বতী শিশুমন্দিরের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি সংগীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান শিশির ভট্টাচার্য। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন পঙ্কজ রায় ও সৈয়দ মণিরুজ্জামান।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু মহাসভার ড. শ্যামাপ্রসাদ জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপন

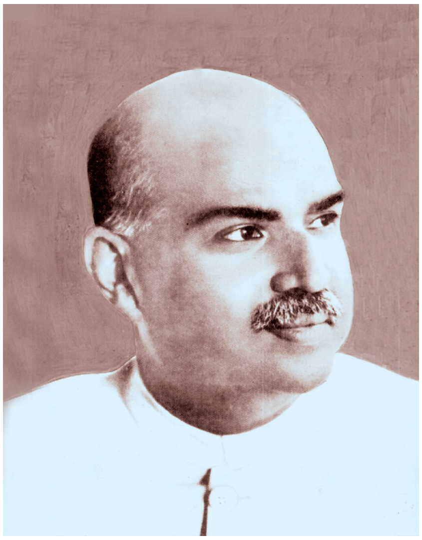

গত ৬ জুলাই বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু মহাসভা নিজস্ব দপ্তরে ভাবগম্ভীর পরিবেশে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১১৮তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। চারটি প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অফিস সেক্রেটারি অঞ্জন ব্যানার্জি। তিনি সারা বছর ধরে সংস্থার কার্যাবলীও আলোক পথযাত্রী হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে উল্লেখ করেন।

প্রধান বক্তা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানবতাবাদী দার্শনিক অসিত কুমার সিংহ পশ্চিমবঙ্গ ও ড. শ্যামাপ্রসাদ বিষয়ে তথ্যভিত্তিক দর্শন সমৃদ্ধ মনোগ্রাহী আলোচনা করেন এবং বলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নিজেই একটা ইতিহাস। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ১৯৪৭-এর ২০ জুন পাকিস্তানের অন্তর্গত বাংলা পশ্চিমবঙ্গ নামে সাংবিধানিক ভাবে ভারতের অঙ্গরাজ্যের স্থান পায়।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন এবং বাংলা ভাষা পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করে বাঙালির মেরুদণ্ড সোজা করে দেন। তার প্রচেষ্টায় শিক্ষক-ছাত্র সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিদ্যা আরাধনার শ্রেষ্ঠ হিসেব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে অল্পবয়সের ভাইস চ্যান্সেলর পদ লাভ করেন এবং শিক্ষায় আধুনিকতম ব্যবহারিক রূপদান করেন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার সন্দীপ মুখার্জি, সাংস্কৃতিক সহায়ক হিংলাজ চ্যাটার্জি প্রমুখ। সকলে সমবেত কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ পরিবেশনের মধ্যে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

পরম্পরা

শ্রীগুরুপূর্ণিমা
উৎসের সন্ধানে অভিযাত্রা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গুরু শুধুই একটি শব্দ নয়। গুরু একটি প্রতীক। ভারতীয় পরম্পরার উৎস। ভারতীয় জীবনের সুর বাঁধা গুরুতেই। গুরুশব্দের অর্থ বিন্যাস করে রঘুবংশে বলা হয়েছে 'গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য হারক। উকারো বিষ্ণুব্যক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ'। যার সাধারণ অর্থ যিনি জীবনের অন্ধকার দূর করেন, তিনিই গুরু। এ অন্ধকার শুধু আধ্যাত্মিক জীবনের নয়, এ অন্ধকার জীবনের সর্বক্ষেত্রের। আর এরই ব্যাখ্যা, মানবজীবনে গুরুর সংখ্যা এগারো।

মানব জীবনের এই একাদশ গুরু হলেন উপাধ্যায় অর্থাৎ শিক্ষক, বাবা, বড়ো ভাই, রাজা, মামা, শ্বশুর, পিতামহ, মাতামহ, বর্ণশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, পিতৃব্য এবং অবশ্যই দীক্ষাদাতা মন্ত্রদ্রষ্টা গুরু।

এখন অবশ্য সাধারণভাবে মন্ত্রদাতাকে গুরু হিসেবে বর্ণনা করা হয়। আর সেই কারণেই গুরুপূজার জন্য নির্দিষ্ট আষাঢ়ের পূর্ণিমাটি মানুষের কাছে গুরু পূর্ণিমা হিসেবেই খ্যাত। ভারতীয় পরম্পরায় কিন্তু এদিন শুধু দীক্ষাদাতা নয়, জীবনের একাদশ গুরুকেই স্মরণ এবং পূজা করা হয়। জানানো হয় কৃতজ্ঞতা। জীবনের সবকিছুই যে ওই গুরু আশীর্বাদে-– এই কথা স্মরণ করে মানুষ বিনম্র হওয়ার শিক্ষা নিয়ে থাকে।

অতীতে গুরু পূর্ণিমার দিনে একাদশ গুরুকেই স্মরণ করা হতো। কিন্তু এখন শুধু আধ্যাত্মিক জীবনের দ্রষ্টা মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরুকে পূজা করা হয় গুরু পর্ণিমায়। এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করা যায় পাশ্চাত্যে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বছরের একটি দিনকে 'থ্যাংকস গিভিং ডে' হিসেবে চিহ্নিত করে অতীতকে স্মরণ করা হয়। ভারতীয় চেতনায় অবশ্য কেবল ওই একটি দিন নয়। বছরের প্রতিটি দিনই অতীত যা উৎসের প্রতি নিবেদিত। প্রতিদিনই সন্ধ্যা তর্পণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় জীবনের ওই উৎসটিকে। প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ভারতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য।

ভারত ও নেপালের একটি জাতীয় অনুষ্ঠান পর্ব এই গুরু- পূর্ণিমা। দেশের হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ এই দিনটি পালন করেন পরম শ্রদ্ধায় মূলত দীক্ষাদাতা ও শিক্ষাদাতা গুরুকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য।

বলা হয়, গুরু পূর্ণিমার দিনটি বছরের অন্যসব দিনের চেয়ে হাজারগুণ ফলপ্রসূ। তাই এই দিন গুরুপূজা করা হয় বিশেষ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে। বর্তমান ও অতীত গুরুদের একইসঙ্গে শ্রদ্ধা জানানো হয় এই দিন।

ভারতীয় পরম্পরায় বিশ্বাস, বর্তমান দেহধারী গুরু প্রকৃতপক্ষে অতীতের সেই আদিগুরুর ধারাকেই বহন করে চলেছেন। তাঁর পূজার মধ্য দিয়ে সেই পরম গুরু— পরমব্রহ্মেরই সন্নিধানে সমাবিষ্ট হওয়ার এক দুর্লভ সুযোগ আসে মানব জীবনে। হিন্দু পরম্পরায় গুরু হলেন পরব্রহ্মের প্রতীক। তিনিই এই স্থূলদেহধারী গুরুর মাধ্যমে উত্তর পুরুষদের শ্রদ্ধা ও পূজা গ্রহণ করেন। দূর করেন জীবনের সব অন্ধকার। দেখান জ্যোতির্ময় জীবনকে। এই আদি গুরু কখনও পরমদেবতা শিব, কখনও বিষ্ণু, কখনও ব্রহ্মা। কখনও বা তিনি বেদ বিভাজক ব্যাসদেব।

বৌদ্ধরা মনে করেন, ভগবান তথাগত বুদ্ধদেবই হলেন আদিগুরু। বুদ্ধদেব এই পুণ্যদিনেই সারনাথে প্রথম উচ্চারণ করেন তাঁর অমৃতবাণী যা মানুষকে মুক্তির পথ দেখাত। গুরু পূর্ণিমায় বিশেষ পূজার মাধ্যমে তাই স্মরণ করা হয় তাঁকে। এই দিন বুদ্ধদেব তাঁর প্রথম পাঁচজন শিষ্যকে যে উপদেশ দেন তা 'ধম্মচক্কপবাত্তনম্' নামে খ্যাত।

জৈন পরম্পরায় আছে, ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীর কৈবল্য লাভের পর এই দিনটি শুরু করেন তাঁর চাতুর্মাস্য ব্রত বা

চার মাসের বর্ষায় সাধনার একটি ক্রম। এই দিনটি তিনি প্রথম দীক্ষা দেন ইন্দ্রভূতি গৌতমকে, যিনি পরবর্তীতে খ্যাত গৌতম স্বামী নামে। এই দিনই তিনি হন ত্রিলোক গুহ। তাই জৈনদের কাছে এই দিনটির অন্য নাম ত্রিলোক গুরু পূর্ণিমা। আচার্যদের শ্রদ্ধা জানাবার পর্ব এটি।

হিন্দু যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে, আদি গুরু হলেন শিব। অনাদি এক অতীতে হিমালয়ের পুণ্যক্ষেত্রে যোগমগ্ন হন তিনি। তাঁর দেহে সেসময় ছিল না কোনও প্রাণের সাড়া। ধ্যানমগ্ন শিবকে দর্শনের জন্য চারদিক থেকে আসেন অসংখ্য মানুষ। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে চলে যান সকলেই। থেকে যান শুধু সাতজন। বহু বর্ষ পরে, যোগসমাধি থেকে বুথিত হন শিব। দেখেন তাঁর সামনে বসে আছেন সাতজন। তাঁরা তাঁর কাছে উপদেশ চান। শিব থাকেন নীরব। বস্তুত প্রত্যাখ্যান করেন তাঁদের। কিন্তু সেই সাতজন একইভাবে অনুনয় বিনয় করতে থাকেন।

অবশেষে আশুতোষ শিব বলেন, উপদেশ দিলেই তো গ্রহণ করতে পারবে না তা। তার জন্য প্রস্তুত করতে হবে নিজেকে। আগে তৈরি করো নিজেকে। এই বলে তিনি তাঁদের দেন প্রস্তুতির শিক্ষা।

চলে অপেক্ষা। এক আধদিন নয়। মাস, বছর পেরিয়ে কেটে যায় তাঁদের ৮৪ বছর এক নিবিড় সাধনায়। তারপর দক্ষিণায়নের সময় আবার ধ্যান ভাঙে শিবের। দেখেন সাধনায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁর ওই সাত ভক্তের দেহ। তাই পরের আষাঢ়ি পূর্ণিমার দিনে তিনি তাঁদের দেন যোগ শিক্ষা। সেই সপ্তসাধক হন সপ্তর্ষি। প্রচার করেন যোগসাধনার কথা। আর তখন থেকেই শিব হন আদিগুরু। এই দিন শিক্ষা দেন তিনি তাঁর এই সাত শিষ্যকে যোগের সাতটি বিশেষ ধারা সম্পর্কে। আজও যোগ সাধনার মৌলিক ভিত্তি সেই সাধন ধারা। গুরু পূর্ণিমা তাই সেই আদিগুরু শিবেরও পূজা। যা গ্রহণ করেন তিনি পার্থিব গুরুদের মাধ্যমে। এই গুরু পূর্ণিমার দিনই যমুনার এক দ্বীপে অবির্ভূত হয়েছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। দিনটি তাই খ্যাত ব্যাস পূর্ণিমা নামেও। ব্যাস সুবিশাল বেদকে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব— এই চার খণ্ডে বিভক্ত করেন। এই বেদই হলো সনাতন ধর্মের মূল। তাই বেদ বিভাজক ব্যাসকেও এই আদিগুরু হিসেবে পূজা করা হয় আষাঢ়ের এই বিশেষ পূর্ণিমা তিথিতে।

নেপালে গুরু পূর্ণিমার দিনটি পালিত হয় ত্রিলোক গুহ পূর্ণিমা নামে। এই দিনটিই নেপালের জাতীয় শিক্ষক দিবস। শিক্ষকদের বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় এই দিনটিতে। সব মিলিয়ে ভারতীয় জীবনে গুরু পূর্ণিমা নিছকই একটি আনুষ্ঠানিক পর্ব নয়। এটি হলো জীবনকে খুঁজে পাওয়ার, তার উৎস বা শিকড়ের সন্ধান পাওয়ার ও স্পর্শ করার দিন। অতীত এবং উৎসের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ারও দিন এটি। এই দিনটি প্রগতির এক অনন্ত ধারা। চিরন্তনের এক অপূর্ব প্রকাশ। ∎

গুরুপূর্ণিমা ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন এক পরম্পরা

প্রবীর মিত্র

সনাতন হিন্দু সংস্কৃতি তথা ভারতীয় সংস্কৃতি যে চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো হলো— অবতারতত্ত্ব, জন্মান্তরতত্ত্ব, কর্মফলকে বিশ্বাস ও গুরু পরম্পরা। এই গুরু পরম্পরা একটি বলিষ্ঠ সংস্কৃতি যা হিন্দুসমাজকে যুগ যুগ ধরে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। গুরুশিষ্যের এই পরম্পরা হিন্দুধর্মের একটি সারতত্ত্ব। উপযুক্ত গুরুলাভ হিন্দুধর্মের প্রাথমিক সোপান।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুর্সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্মৈশ্রীগুরবে নমঃ।।

অর্থাৎ গুরু ব্রহ্মা। গুরু বিষ্ণু এবং গুরুই মহেশ্বর। সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মারূপী গুরুকে প্রণাম। এই শ্লোক থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ঈশ্বরের চাইতেও গুরুকে উচ্চস্থান প্রদান করা হয়েছে। বাস্তবে গুরু দিব্য জ্ঞান প্রদান করে দিব্যচক্ষু উন্মোচিত করেন। এইভাবে আমাদের দ্বিতীয় জন্ম হয়। এই জন্য গুরু ব্রহ্মাস্বরূপ। গুরু সারা জীবন আমাদের লালন পালন করেন। কণ্টকাকীর্ণ পথে গুরু আমাদের পথ প্রদর্শন করেন। এই জন্য গুরু বিষ্ণু ভগবান স্বরূপ। গুরু আমাদের অসৎ চিন্তা এবং দুর্গুণ নাশ করেন। এই জন্য গুরু শঙ্কর স্বরূপ। যদি আমরা শ্রদ্ধাপূর্বক অনুভব করি তাহলে দেখা যাবে গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম। গুরু সমস্ত শক্তির প্রতিভু।

গুরু শব্দ পরম্পরাবোধক শব্দ। গুরু শব্দের অর্থ মহান। গুরু তিনিই, যিনি জ্ঞানের দ্বারা চরিত্রের দ্বারা মানবীয় ও ঈশ্বরীয় গুণের দ্বারা শিষ্যকে পুষ্ট করেন। সদ্ গুরু সর্বদা ত্যাগ, তপস্যা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার প্রতিমূর্তি। এই জন্য গুরুর জীবন অনুকরণীয় ও প্রেরণাদায়ক। গুরুশব্দের শব্দগত বিশ্লেষণ করলে অর্থ হয়— ‘‘গুকারো অন্ধকারঃ রুকারো তন্নিরাবকঃ।। অর্থাৎ অন্ধকার যিনি নিবারণ করেন তিনিই গুরু।

“অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে
নমঃ।।”

যিনি অজ্ঞানরূপ তিমিরান্ধজীবের চক্ষু জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা উন্মীলিত করেন, সেই গুরুকে নমস্কার। ঠিক তেমনি, যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দিয়ে সমগ্র রাষ্ট্র জীবনের অন্ধকার দূর করেন, তিনিই রাষ্ট্রগুরু।

ভারতবর্ষ গুরুর দেশ। শাস্ত্রে আছে— গুরুকে স্মরণ না করলে কোনও কাজ সিদ্ধ হয় না। মানুষের পঞ্চভৌতিক দেহে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংস্কার শুদ্ধির জন্য গুরুর মন্ত্র গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাকে গুরুপূর্ণিমা বলা হয়। প্রত্যেক মাসেই পূর্ণিমা আসে। কিন্তু আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় গ্রহের যে অবস্থান থাকে এই সময় বৃহস্পতি অর্থাৎ গুরু গ্রহের তত্ত্ব অন্য পূর্ণিমার চাইতে বেশি হয়। এইজন্য এই দিন গুরুকৃপা ও গুরুর আশীর্বাদ বেশি প্রাপ্ত হয়। গুরু পূর্ণিমার অপর নাম ব্যাস পূর্ণিমা। মহর্ষি ব্যাসদেব এইদিনে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ব্যাসদেব বৃহস্পতিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে বৃহস্পতিবারকে গুরুবার বলা হয়। ব্যাসদেবের নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। মহাভারতের যুগে দু'জন কৃষ্ণ প্রসিদ্ধ ছিলেন— এক 'বাসুদেব কৃষ্ণ' এবং দুই 'দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ'। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের আর এক নাম ছিল পরাশর্য। কারণ তিনি পরাশরের পুত্র ছিলেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের আর এক নাম ছিল 'বাদরায়ণ'। কারণ উনি উত্তরাখণ্ডের বদরীনাথধামের নিকট বদরিকা আশ্রমে কঠিন তপস্যা করে জ্ঞান প্রাপ্ত করেছিলেন। ব্যাসদেব ভারতীয় জ্ঞানকে সুনিয়োজিত ভাবে সূত্রবদ্ধ ও সুগঠিত করার অভুতপূর্ব কাজ করেছেন। তিনি অপৌরুষের বেদকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদকে সম্যকরূপে লিপিবদ্ধ করার মহান কাজ করেছেন। জীবন ও সাহিত্যের প্রত্যেকটি

ক্ষেত্রে মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাই ভারতের জনজীবনে গুরুপূর্ণিমা ও ব্যাসপূর্ণিমা একাকার হয়ে গেছে। ব্যাসজয়ন্তীর এই পবিত্র দিনে ব্যাসদেবকে রাষ্ট্রগুরু হিসাবে ভারতবর্ষের লোক বন্দনা করে ও স্মরণ করে। বেদের প্রাচীনতার মতো গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি পরম্পরাও অতি প্রাচীন। গুরুশিষ্যের পরম্পরার উল্লেখ অনেক শাস্ত্র ও গ্রন্থে আছে। দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি ও অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের উল্লেখ আছে। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম বাল্যকালে বশিষ্ঠের আশ্রমে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সন্দীপনি মুনির আশ্রমে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। চাণক্যের মতো গুরু চন্দ্রগুপ্তকে চক্রবর্তী সম্রাট তৈরি করেছিলেন। সমর্থগুরু রামদাস বর্বর মুসলমান আক্রমণকারীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য ছত্রপতি শিবাজীর মধ্যে সামর্থ্য বিকশিত করেছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ অনুসারে ভগবান বুদ্ধ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার দিন প্রথম পাঁচজন শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন। শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যেও গুরুর বিশেষ স্থান রয়েছে। দেহধারীকেই গুরু মানা জরুরি নয়। শিখ সম্প্রদায় 'গুরু গ্রন্থ সাহেব'কেই গুরু হিসাবে মান্যতা দিয়েছে। একলব্য তো মাটির তৈরি গুরুর সামনে অস্ত্রশিক্ষা করে মহান ধনুর্ধর হয়েছিলেন।

কিন্তু বিগত শতাব্দীতে গুরুশিষ্য পরম্পরায় অসংগতি দেখা দিয়েছে। সেই জন্যই এই অসংগতি লক্ষ্য করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই গৈরিক ধ্বজকে গুরুরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সঙ্ঘ কোনও ব্যক্তিবিশেষকে গুরুরূপে স্বীকার করেনি। সঙ্ঘের লক্ষ্য বৈভবশালী হিন্দুরাষ্ট্রের পুনর্নির্মাণ। এই উদ্দেশ্য পূর্তির জন্যই হিন্দুসংগঠন। এই বৈচিত্র্যময় হিন্দুরাষ্ট্রের সমগ্র মানুষকে এক ব্যক্তি গুরুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাঁর ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। সেই জন্য ভগোয়া ধ্বজ বা গৈরিক পতাকাই সঙ্ঘের গুরু। ত্যাগ, জ্ঞান, পবিত্রতা ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাহস, স্ফূর্তি, ত্যাগ ও বলিদানের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে এই গৈরিক পতাকা।

গুরুপূজা ও গুরুদক্ষিণা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। গুরুপূর্ণিমার দিন স্বয়ংসেবকরা গৈরিক গুরুর সামনে রাষ্ট্রের প্রতি নিজের নিজের সমর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তপোময় ও জ্ঞাননিষ্ঠ ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাধিক সশক্ত, চির পুরাতন ও নিত্য নতুন প্রতীকের প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা হবে তাঁর চিন্তা ও উপদেশ নিজ জীবন ও সমাজজীবনে প্রতিফলিত করা। তবেই হবে তাঁর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও গুরুপূর্ণিমা তথা ব্যাস পূর্ণিমা পালনের প্রকৃত সার্থকতা। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

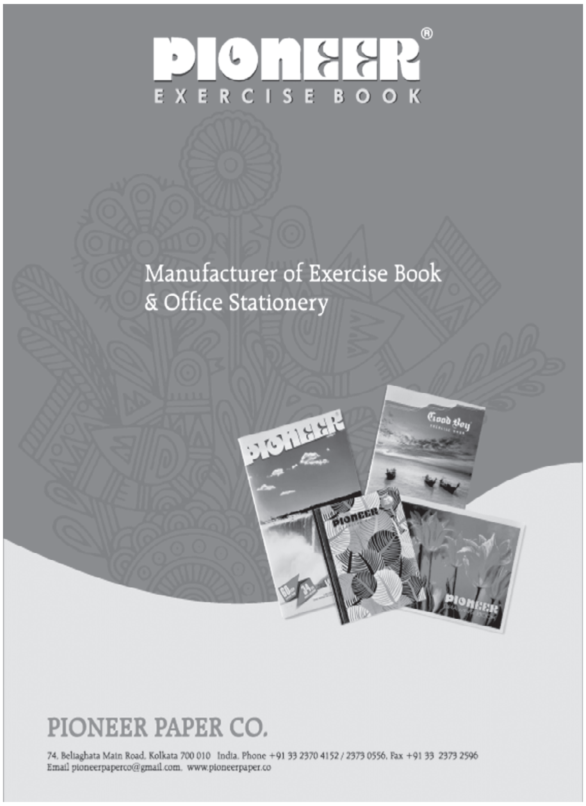

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

দু'দিনের দেখা

রূপশ্রী দত্ত

বাসটা কলকাতা থেকে সাড়ে চার ঘণ্টায় এসে পৌঁছোল মায়াপুরে। অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে বিনীতাও তার সহকর্মিণী সিনিয়ার টিচার মণিকাদিকে নিয়ে নেমে পড়ল বাস থেকে। বাসের মুণ্ডিতমস্তক কন্ডাক্টর একগাল হেসে বলল—'হরেকৃষ্ণ। সবাই তাহলে ভালোয় ভালোয় এসে পৌঁছোলেন তো?' প্রত্যুত্তরে যাত্রীরাও সমস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' বলে বাস থেকে নেমে পড়লেন। মণিকাদি বললেন—ওদের এই 'হরেকৃষ্ণ শব্দটা সব কথার আগে শুনতে বেশ ভালোই লাগে, না রে বিনীতা?' বিনীতা তার জলপাই-সবুজ রঙের শালটা সামনে নিয়ে ঝকঝকে চোখে হেসে বলল—'হ্যাঁ। আমাদের মতো পাপীতাপী মানুষদেরও বারবার 'হরেকৃষ্ণ' শুনে বোধহয় কিছুটা চিত্তশুদ্ধি হয়ে যায়।'

ইস্কনের গেস্ট হাউসে এসে ওঠে ওরা। বিরাট বড় গেট। তার মধ্যে কম্পাউন্ড। মাঝে মাঝে বাঁধানো রাস্তা। অতিথিশালার নামগুলিও সুন্দর—'শঙ্খভবন', 'চক্রভবন', 'পদ্মভবন'। বিনীতারা জায়গা পেয়েছে 'শঙ্খভবনে'। নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকল ওরা। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঝকমকে নীল আকাশ। ডিসেম্বরের শীতের মৃদু হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে নাম-না-জানা গাছের পাতাগুলো। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়েছে, সরু আঁকাবাঁকা মেঠোরাস্তা।

মণিকাদির স্বামী একটি বেসরকারি কলেজের অধ্যাপক। ছেলে পিঙ্কু এবার বি.কম পরীক্ষা দেবে। বাড়িতে অনেক দিনের পুরনো ভালো কাজের লোক রামসেবকের ভরসাতেই মণিকাদি ওদের রেখে এসেছেন। আর বিনীতার বাড়িতে বাবা, মা ও ছোটোভাই। মণিকাদি বললেন—চল্ মন্দির দর্শন করে খাওয়া সেরে নিই।

স্নান সেরে দুজনেরই গন্তব্য উদ্যান সংলগ্ন মন্দির। অপূর্ব শ্বেতপাথরের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি। অদূরে ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা এ.সি. ভক্তিবেদান্তের মানুষ-প্রমাণ উপবিষ্ট মূর্তি দেখলে জীবন্ত বলে ভ্রম হয়। মঞ্চেরই একধারে বিক্রি হচ্ছে প্রসাদ। ওরা দক্ষিণা দিয়ে প্রণাম সেরে প্রসাদ কিনল। তিনটি লাড্ডু সমেত একখণ্ড নিরামিষ কেক আছে এক একটি পকেটে।

দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের জন্য দীর্ঘ সারিবদ্ধ লোকের লাইন দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। 'শঙ্খভবন' থেকে খাবার জায়গাটা বেশ কিছুটা দূর। ওরা জানত না, এখানে 'বয়' বা বেয়ারা'র অস্তিত্ব নেই। অন্য যাত্রীরা এ বিষয়ে আগে ওকাকিবহাল থাকায়, তাদের সকলের হাতেই ছিমছাম বহনযোগ্য কিটব্যাগ। দুদিনের শীতবস্ত্র সমেত স্ফীতকলেবর সুটকেশ হাতে দীর্ঘপথ পরিক্রমা এদের পক্ষে বেশ কষ্টকরই হয়েছিল।

সুশৃঙ্খলভাবে কর্মীরা নিরামিষ ব্যঞ্জন, দই, মিষ্টি কলাপাতায় পরিবেশন করছিল। বিনীতা অবাক হয়ে দেখছিল। হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল এক বিশেষজনের দিকে। অবিকল টিভিতে অনেক বছর আগে দেখা পিটার ব্রুকের

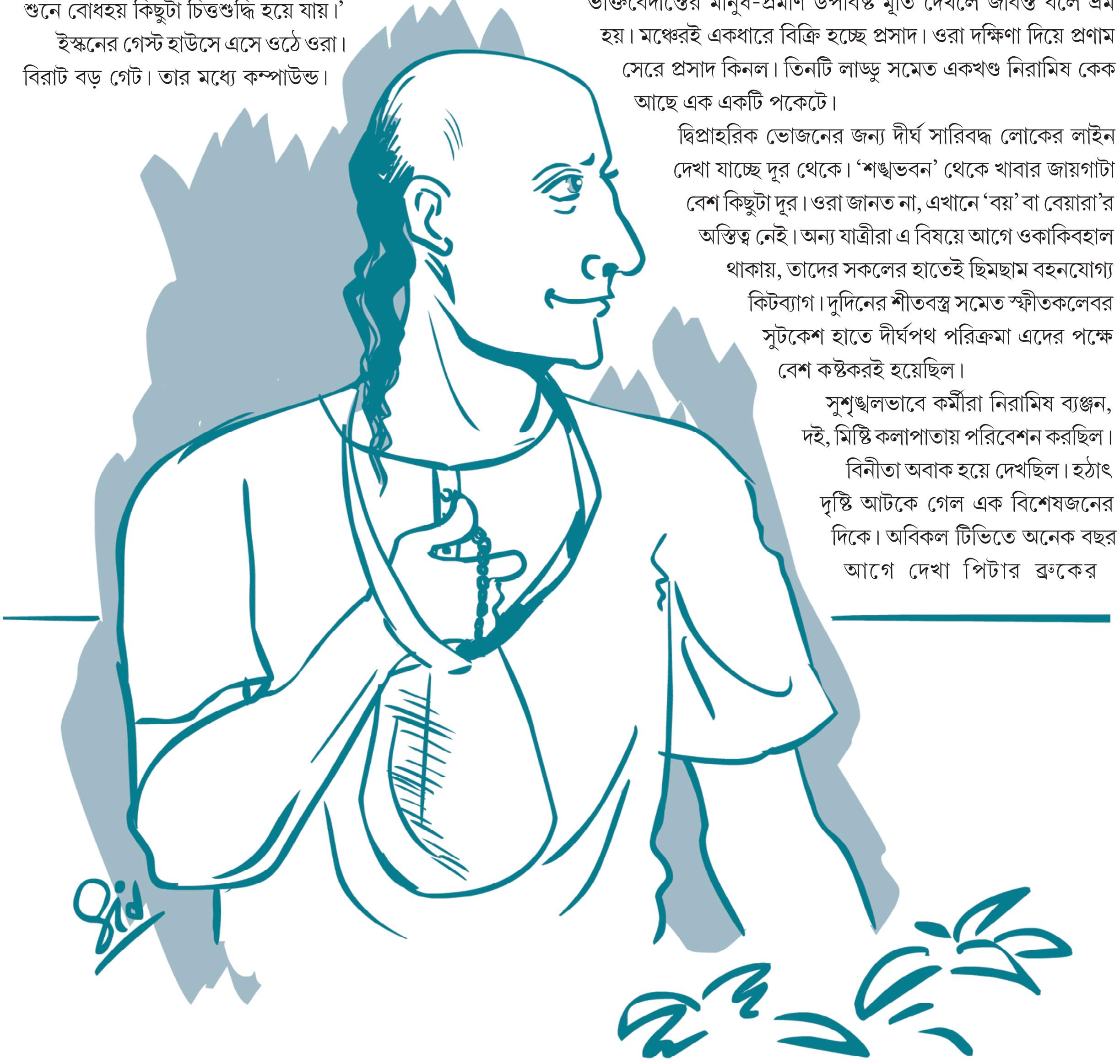

মহাভারতের যুধিষ্ঠির। সেই বিদেশি অভিনেতার মতো এরও পেছনের চুলের দৈর্ঘ্য, কিঞ্চিৎ বেশি। মাটির জলপাত্রে সে জল ঢেলে দিচ্ছে। মণিকাদি বললেন— 'এইসব বিদেশি ছেলে, দেশ ছেড়ে বিলাসিতা ছেড়ে এক বাঙালি ধর্মগুরুর টানে, এদেশের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে— ভাবলে অবাক লাগে।'

শীতের দুপুরের মিঠে রোদে ওরা আহারান্তে চলে গেল গুরুকুলের দিকে। রাস্তাটা নির্জন সরু মেঠো পায়ে চলার রাস্তা। দূরের ছোটো নদীতে কৃচ্ছ্রসাধনরত তপস্বীর মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা, কালো নানা আকারের বক। মাইকে ভেসে আসা ইস্কনের মন্দির থেকে পদাবলী কীর্তনের আখর ছড়িয়ে পড়ছে সবখানে। রাস্তার ছোটো-ছোটো বাড়ি দেখে ওরা স্থানীয় মহিলাকে জিজ্ঞেস করল— 'এগুলো কার বাড়ি?' স্থানীয় মহিলাটি ইস্কন মন্দিরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল— 'এটা ছায়েব-মঠ আর এগুলো ওদের থাকবার বাড়ি।'

বিকেলে ইস্কন-চত্বরের এক ভোজনালয়ে গেল ওরা। চা, কফিও এখানে নেশার দ্রব্যের আওতায় পড়ে। অতএব নিষিদ্ধ। ওরা অবাক হয়ে দেখল, সকালে খাবার পরিবেশনকারী সেই বিদেশি তরুণ মাটির ভাঁড়ে ধূমায়িত পানীয় পান করছে। মণিকাদি বললেন— 'এক্সকিউজ মি। ইজ দিস টি?' ওদের সম্পূর্ণ অবাক করে দিয়ে বিদেশি বলল— 'না। এটা তুলসীপাতা ফোটানো আয়ুর্বেদিক টি'। কিন্তু সরি ওটা তো ফুরিয়ে গেছে। আপনারা 'জিঞ্জার টি' খান। দ্যাট্স্ অল্সো গুড।' পরিচায় হলো কৃষ্ণপ্রেমের। এটাই তার পরিবর্তিত নাম। পূর্বজীবনের নাম ধাম সব কিছুই জীর্ণবস্ত্রের মতোই ত্যাগ করে আসতে হয় ওদের।

সন্ধ্যারতির সময় মন্দিরে গিয়ে ওরা দেখল, কৃষ্ণপ্রেম ও আরও কয়েকজন সহচর মন্দিরের হলঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত উদ্দাম নৃত্য করে চলেছে 'হরেকৃষ্ণ' নামগানের সঙ্গে। সেই ভাবাবেগের ছোঁয়ায় জনমণ্ডলীর কেউ কেউ দু-হাত তুলে নৃত্যে ও নামগানে অংশগ্রহণ করছেন। বিনীতা বলল— দেখ মণিকাদি, কৃষ্ণপ্রেম সত্যিই সার্থকনামা। মণিকাদি বললেন— 'ঠিক বলেছিস।'

জলঙ্গী নদীর একপারে নবদ্বীপ, অন্য পারে মায়াপুর। নবদ্বীপের রিক্শাওয়ালা বলল— 'মায়াপুরে যা দেখেছেন, সবই পরে তৈরি হয়েছে। মহাপ্রভুর আসল জন্মস্থান, শ্রীবাসের অঙ্গন— সব এখানেই। মহাপ্রভুর পাঁচশো বছরের জন্মদিনে এখানেই বারোদিন ধরে উৎসব হলো। বড় বড় 'মেনিশ্টার' সকলে এসেছিলেন।'

আজ রবিবার। শুক্রবার থেকে দুদিনের সফর শেষ। ফেরার বাসটা দাঁড়িয়ে আছে। 'পদ্মভবন'-এর দিক থেকে এগিয়ে আসছে কৃষ্ণপ্রেম। হাতে জপের মালা। তাতে গৌর-নিতাইয়ের ছবি। অবিরাম 'হরেকৃষ্ণ' নামজপ করে চলেছে সে। ফাঁকে ফাঁকে দরকার মতো কথাও বলছে। বিনীতা বলল— 'আবার আসবার ইচ্ছে রইল।' কৃষ্ণপ্রেম বলল— 'নিশ্চয়ই আবার আসবেন। কৃষ্ণের চিন্তা করবেন। আমরা সকলেই তো তাঁকেই খুঁজছি, তাঁকেই চাইছি। আপনাদের ভালো হোক। হরেকৃষ্ণ।' কৃষ্ণপ্রেম দ্রুতপদে মন্দিরের দিকে চলে গেল। ■

দুই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে নারী

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

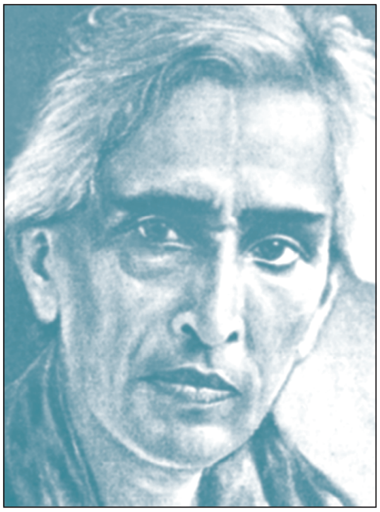

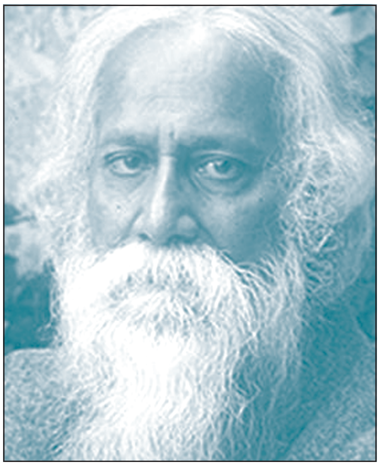

রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যের জগতে দুই বিস্ময়কর প্রতিভা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবেদন তো বিশ্বজনীন। শরৎ-সাহিত্য আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে চলেছে। দুই সাহিত্যিকই তাদের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী রচিত সাহিত্য সম্ভারে অজস্র অনবদ্য নারী-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'নারী-প্রসঙ্গে' বলেছেন, ''যে কোনও সাধনাতে প্রেরণা-দানের শক্তিটি নারীর শক্তি। শিক্ষায় রাজনীতিতে নারীর অন্তরের প্রেরণা না পেলে কখনও শক্তি সত্য ও গভীর হয় না। আমাদের সব অনুষ্ঠানেই নারীর কর্তব্য, নারীর সাধনা অনেক পরিমাণে দরকার।'' একই সঙ্গে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন, 'নারীর যে মহাশক্তি আছে, তা কেবল তাঁদের গৃহ-সংসারই লুটে নিচ্ছে। দেশ আর নারীর সেবাকে পাচ্ছে না।''

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখি দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ সমস্ত কিছু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নারী-চরিত্রদের প্রকাশ করেছেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনী পরশ্রীকাতর, নিরপরাধ আশার জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনতে সে বদ্ধপরিকর, অথচ তার প্রতিও যে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের অসীম মমতা ছিল তা আলেখ্যটিতে পরিস্ফুট। বিনোদিনীর আশার প্রতি ঈর্ষার কারণ নিজের বৈধব্য ও অসুখী জীবন, সে অকারণে ঈর্ষাকাতর নয়, সেই জন্যই সে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পেয়েছে।

'গোরা' উপন্যাসের সুচরিতার চরিত্র রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর চরিত্র অবলম্বনে অঙ্কিত। এই উপন্যাসেরই ললিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলা দেবী চৌধুরাণীর সাদৃশ্য রয়েছে। উপন্যাসটির প্রায় শুরুতেই সুচরিতার সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক উপন্যাসেই নর-নারীর সৌন্দর্য বর্ণনার মাধ্যমে তাঁদের 'অন্তরাত্মা'র বিশেষত্বকে প্রকাশ করেছেন। এখানেও সুচরিতার রূপবর্ণনায় তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচয় আমরা লাভ করি : বিনয় ''আয়নার দিকে চাহিয়া দেখিল, যে মুখের ছায়া পড়িয়াছে সে কী সুন্দর মুখ! সেই উদ্‌বিগ্ন স্নেহে আনত তরুণ মুখের কোমলতামণ্ডিত উজ্জ্বলতা বিনয়ের চোখে সৃষ্টির সদ্যপ্রকাশিত একটি নূতন বিস্ময়ের মতো ঠেকিল। সে কী আশ্চর্য চক্ষু! প্রথম নজরেই মনে হয়, এই দৃষ্টির একটা অসন্দিগ্ধ প্রভাব আছে। তাহাতে সংকোচ নাই, দ্বিধা নাই। তাহা একটা স্থির শক্তিতে পূর্ণ।'' সুচরিতা শান্ত, সংযমী, কোমল অথচ দৃঢ়। অন্যদিকে ললিতা আপনার নিয়মে চলে, ইচ্ছা করিলে কড়া কড়া কথা, তবু একে অন্যকে নিবিড় ভালোবাসে।

রবীন্দ্রনাথের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনী। সে সুচরিতার মতো শান্ত, কোমল সংযমী নয়, কিন্তু সে পরমকরুণাময় রবীন্দ্রনাথের স্নেহ লাভ করেছে। উপন্যাসের প্রথমদিকে দামিনী চঞ্চল, উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য। কিন্তু তার অবাধ্যতার কারণ, ''যে সময়ে দামিনীর বাপ এবং ছোটো ছোটো ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়িতে প্রত্যহ ষাট-সত্তর জন ভক্তের সেবার অন্ন তাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।'' অন্তরে সেও কোমল। সে বাবা-মা-ভাইদের আলোবাসে। শচীশকে ভালোবাসে, শ্রীবিলাসকেও, রবীন্দ্রনাথ গভীর মমতায় তাঁর চরিত্র এঁকেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আরেকটি অনবদ্য সৃষ্টি 'যোগাযোগ'-এর কুমুদিনী। সে বলে, ''এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।''

শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কিরণময়ীর সঙ্গে অনেক সমালোচক বিনোদিনীর সাদৃশ্য দেখেছেন। উভয়েরই অসুখী জীবন। অকাল বৈধব্য নেমে আসার পর বিনোদিনী বিহারীকে ভালোবেসেছে, আশার জীবনে দুর্ভাগ্য ডেকে আনার জন্য মহেন্দ্রের সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করেছে। কিরণময়ী উপেন্দ্রকে নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে দিবাকরের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছে। কিন্তু কিরণময়ীর মতো প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ মননশক্তি বিনোদিনীর নেই। উপেন্দ্রর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে কিরণময়ী উন্মাদ হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে বলেছেন, ''নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার দিদিকে মনে পড়ে। যদি তাঁর ভাগ্যেও এত বড় দুর্নাম ঘটিতে পারে, তখন সংসারে পারে না কি? এক আমি, আর সেই সমস্ত কালের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী তিনি ছাড়া, জগতে আর কেহ কি আছে, যে অন্নদাকে একটুখানি স্নেহের সঙ্গেও স্মরণ করিবে! তাই ভাবি না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নেই।'' অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, বিরাজ বৌ, সাবিত্রী, অচলা— প্রত্যেকের অন্তর দুঃখের আগুনে পুড়ে সোনা হয়ে উঠেছে, অথচ সমাজের চোখে তাঁরা 'কলঙ্কিনী'। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা সাহসী, সংস্কারমুক্তও। 'বামুনের মেয়ে'র সন্ধ্যা অরুণকে বলে, ''মেয়েমানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও কাজ আছে কিনা আমি সেইটে জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্ছি।'' ■

বীর সৈনিক চুরকা মুর্মু

১৯৫১ সালের ২ জুলাই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটের কাছে চকরাম প্রসাদ গ্রামে চুরকা মুর্মু জন্মগ্রহণ করে। পিতা খেলারাম মুর্মু। মাতা সুমি হাঁসদা। ছোটোবেলায় তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। ১৯৬৯ সালে প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ সম্পন্ন করে তিনি গ্রামের শাখার মুখ্যশিক্ষক হন। গ্রামে বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা থাকত। গ্রামবাসীদের পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় গ্রামে একটি কুয়ো তৈরি করেন। গ্রামের সবাই চুরকার আচার ব্যবহারে মুগ্ধ।

পাকিস্তানের শোষণ ও দমনপীড়ন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরোভাগে ছিল ভারত। তাই সেই সময় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে শোনা যেত রণদামামা। পাকিস্তানি খানসেনারা চোরাগোপ্তা ভাবে সীমান্তের গ্রামগুলিতে আক্রমণ চালাত। ১৯৭১, ১৮ আগস্ট ভোরে খানসেনারা মুক্তিফৌজের ছদ্মবেশে ভারতের এক মাইল ভিতরে চককালু গ্রামে পৌঁছে যায়। উদ্দেশ্য চকরাম গ্রামের বি এস এফ ক্যাম্প দখল করে নেওয়া। চকরাম গ্রাম দখল করে নিতে পারলে সহজেই জেলার সদর শহর বালুরঘাটে আঘাত হানতে পারবে। চককালু থেকে খানসেনারা চকরাম

গ্রামে গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকলে গ্রামবাসীরা ভয়ে পালাতে শুরু করে।

চুরকা তখন সবে বালুরঘাট জে এল পি বিদ্যাচক্র থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। গ্রামবাসীদের পালাতে দেখে সে চিৎকার করে বলে, ‘ বিপদের দিনে কেউ পালাবেন না। খানসেনারা গ্রাম দখল করে নেবে। বি এস এফ ক্যাম্পে খবর দিতে হবে।’ বলেই চুরকা কয়েকজনকে নিয়ে ছুটে বি এস এফ ক্যাম্পে যায়। ক্যাম্পে তখন ৪/৫ জন জওয়ান। তারাও প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জওয়ানরা বলল, ‘গোলার বাক্স বহন করার জন্য কয়েকজনকে দরকার। কিন্তু ভয়ে কেউ আসছে না।’ শোনামাত্র চুরকা ও তার দুই বন্ধু গোলার বাক্স বয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়ে যায়। দুই বন্ধু বাক্স মাথায় করে দু'জন জওয়ানের সঙ্গে গ্রামের উত্তর দিকে চলে যায়। আর চুরকা গুলির বাক্স মাথায় করে গ্রামের দক্ষিণ দিকে চলে আসে। পুকুরের ধারে পাটখেতের পাশে দুটি বড় গাছের আড়ালে দু'জন জওয়ান পজিশন নেয়। জওয়ানদের গুলি সরবাহের জন্য কাছেই পাটখেতের মধ্যে বাক্স নিয়ে চুরকা বসে থাকে। একটু পরেই খানসেনারা ভারতীয় জওয়ান দু'জনকে ঘিরে ফেলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। পাটখেতের মধ্যে থেকে চুরকা সব লক্ষ্য করছিল। হয়তো তার ভাবনায় এসেছিল সেও ধরা পড়ে যেতে পারে। গুলির বাক্স পাকিস্তানি সেনার হাতে কিছুতেই যেতে দেওয়া যাবে না। তাই সেগুলি পুকুরে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। পাটখেতেরে মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গুলির বাক্স নিয়ে পুকুরের ধারে পৌঁছাল। আগের রাত্রে প্রবল বৃষ্টির জন্য পুকুরের পাড় পিছল হয়ে ছিল। গুলির বাক্স পুকুরের জলে ফেলার সময় পা হড়কে বাক্স-সহ চুরকা জলে পড়ে যায়। পুকুরের অন্য পাড়ে লুকিয়ে থাকা খানসেনারা শব্দ শুনে চুরকাকে দেখে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে খানসেনার গুলিতে চুরকার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। রক্তে পুকুরের জল লাল হয়ে যায়। ‘ভারতমাতা কী জয়’ বলে চুরকা বীরগতি লাভ করে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ শেষ হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারপর চুক্তি অনুসারে বন্দি বিনিময় হয়। মুক্তি পাওয়া ভারতীয় জওয়ানরা চুরকার বীরত্বের কথা প্রকাশ করেন। সঙ্ঘের শাখা থেকে চুরকা শিক্ষা পেয়েছে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে দেশ। দেশপ্রেমের এই সংস্কার তাকে সৈনিকে পরিণত করেছে। তাই দেশের বিপদে চুরকা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তার নিদর্শন রেখে গেল।

—শক্তিপদ ঠাকুর

ভারতের পথে পথে

হুমা

ওড়িশার সম্বলপুর থেকে ৩২ কিলোমিটার দক্ষিণে হুমা শৈবতীর্থ রূপে বিখ্যাত। ওড়িশার স্বকীয়তা থেকে সরে গিয়ে গড়ে উঠেছে হুমার মন্দিররাজি। ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যে নজিরবিহীন ভাবে ৪৭ ডিগ্রি হেলে রয়েছে হুমার এই মন্দির। ১৬৭০ খ্রিস্ট্রাব্দে বলবীর সিংহ চৌহানের নির্মিত মূল মন্দিরের দেবতা বিমলেশ্বর শিব। বিগ্রহও হেলে রয়েছে। তবে মন্দিরের চূড়াটি সোজা। ভুবনেশ্বরী, কপিলেশ্বরী প্রভৃতি সব মন্দিরই হেলানো। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে দূরদূরান্ত থেকে মানুষজন আসেন এখানে। নীচে বয়ে চলেছে মহানদী। খাবার দিলে প্রচুর কুডো মাছ দেখা যায়। মাছগুলিকে শিব ঠাকুরের চ্যালা মনে করেন স্থানীয় মানুষ। মহানদী ছোটো টিলার মাঝে দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে। মাধুর্যভরা পরিবেশ।

জানো কি?

- হরিয়ানার কারনালে দুগ্ধ গবেষণা কেন্দ্র।
- পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে পাট গবেষণা কেন্দ্র।
- মহারাস্ট্রের পুনায় মৌমাছি গবেষণা কেন্দ্র।
- কর্ণাটকের মহীশূরে রেশম গবেষণা কেন্দ্র।
- হিমাচল প্রদেশের সিমলাতে আলু গবেষণা কেন্দ্র।
- উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে এবং তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র।
- কেরলের কাশড়াগাড়ে কফি গবেষণা কেন্দ্র।

ভালো কথা

ঠাকুমার ভালোবাসা

মিলিদের বাড়িটা যেন চিড়িয়াখানা। কী নেই ওদের বাড়িতে! কুকুর, বেড়াল, খরগোশ,পায়রা, শালিক, ময়না, গোরু, ছাগল সব। রবিবার ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখি উঠোনে সবগুলো গায়ে গায়ে শুয়ে বসে আছে। অবাক কাণ্ড! আমাকে দেখে ভয়ই করছে না। একটু পরেই মিলির ঠাকুমা উঠোনে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে পায়রা শালিক ময়না ঠাকুমার ঘাড়ে মাথায় উড়ে বসল আর কুকুর বেড়াল খরগোশ ঠাকুমার পায়ের ওপর নেতিয়ে পড়তে লাগল। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। ঠাকুমা বলল, ভালোবাসতে হয় বুঝলি। ভালোবাসলে সবাই আপন হয়, কেউ তখন ভয় করবে না।

শ্রেয়া কুমার, সপ্তম শ্রেণী, মানবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

বর্ষা এল না

অস্মিতা রায়, চতুর্থ শ্রেণী, দেবীনগর, উঃ দিনাজপুর।

বৃষ্টি হলেও বর্ষা এল না
গরমটা মোটেও কমল না,
একটু একটু টিপটিপে বৃষ্টি
করছে শুধু কাজের ক্ষতি।

স্কুলে হচ্ছে না রেনি ডে
আনন্দ মোটেই হচ্ছে না যে,
ভাবছি কবে আসবে ঘোর বৃষ্টি
ভাসিয়ে দেবে সকল সৃষ্টি।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। অভিমন্যু ।। ১৮

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতীয় হকির সূর্যোদয়

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

নেদারল্যান্ডের মাটিতে বিশ্ব হকির পরাক্রমশালী দেশ নেদারল্যান্ডের সঙ্গে তুল্যমূল্য খেলে ভারতীয় হকি দল ম্যাচ ড্র রেখেছে এ দৃশ্য স্মরণাতীতকালের মধ্যে ঘটেনি। এই মুহূর্তে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দুটি স্থানে থাকা আর্জেন্টিনা ও বেলজিয়াম। এর মধ্যে একনম্বর আর্জেন্টিনাকে হার স্বীকার করতে হয়েছে আর গোটা ম্যাচ দাপিয়ে খেলেও বেলজিয়ামের ম্যাচ ড্র হয়েছে। পাকিস্তানের যথারীতি চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া। কেবলমাত্র অস্ট্রেলিয়ার গাঁটটি উপড়ে ফেলতে ব্যর্থ হওয়া ছাড়া মিনি বিশ্বকাপ বলে অভিহিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সব অর্থেই যেন ভারতীয় হকির সূর্যোদয় দেখতে পাওয়া গেল সম্প্রতি।

তাও ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে গোটা ম্যাচে ভারতেরই আধিপত্য ছিল। টাইব্রেকারে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলে ভারতীয়রা। আসলে পেনাল্টি শুট আউটের নতুন নিয়মের সঙ্গে এখনও ততটা সড়গড় হয়ে উঠতে পারেনি ভারতীয়রা। দু'বছর আগে ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। সেবারেও লন্ডনে এই টুর্নামেন্টে ভারত ফাইনালে উঠে এই পদ্ধতিতে এঁটে উঠতে পারেনি। আসলে বিশ্ব হকি সংস্থায় এখন দাপট ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়ার। ভারত ও পাকিস্তানের সনাতনী-শিল্পমণ্ডিত হকিকে আটকে রাখার জন্য নানা ফন্দিফিকির করে এই শ্বেতাঙ্গ দুনিয়ার কর্তারা। আগে ফিল্ড গেমে এঁটে উঠতে না পেরে ঘাসের মাঠ তুলে দিয়ে কৃত্রিম অ্যাস্ট্রোটার্ফ বসিয়ে দেয় সর্বত্র। আর যাবতীয় টুর্নামেন্ট এরপর অ্যাস্ট্রোটার্ফে করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়া হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের আপত্তি সত্ত্বেও এই ধরনের টার্ফে স্কিলের তুলনায় গতি, শক্তির প্রকাশ অনেক বেশি। স্বভাবতই ভারত, পাকিস্তানের তুলনায় ফিজিকাল পাওয়ার হকিতে শ্বেতাঙ্গ দেশগুলি বেশি স্বচ্ছন্দ, তাই তাদের একচেটিয়া সাফল্য করায়ত্ত।

এবার আন্তর্জাতিক হকি সংস্থা খেলার মধ্যেও অনেক টেকনিকাল পরিবর্তন এনে ফেলে যাতে আরও বিপাকে খেলা যায় এশিয় দেশগুলিকে। তাই পেনাল্টি শুট আউটে এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন। এত রকম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গত তিন-চার বছরে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, বিশ্ব হকি লিগে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলে যাচ্ছে ভারত। কখনও ফাইনালে, কখনও বা নিদেন পক্ষে সেমিফাইনাল পর্যন্ত অবধারিত উত্তরণ আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে দেশবাসীকে। নরেন্দ্র বাত্রা আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার সর্বোচ্চ পদে বসার পর নানা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা করেছে হকি ইন্ডিয়া। বাত্রা সবরকম সহযোগিতা করছেন বিশ্ব হকির মূল স্রোতের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ভারতীয় হকিকে তুলে আনার জন্য।

বড় বড় শিল্প সংস্থা ভারতীয় হকির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রিমিয়ার হকি লিগ চালু করাও ভারতের উন্নতির অন্যতম কারণ। দুনিয়ার নামি তারকারা এই লিগে খেলতে আসে। ভারতের সিনিয়র জুনিয়র সব স্তরের খেলোয়াড়রা এই সব বড় বড় খেলোয়াড়দের সঙ্গে বছরের পর বছর ৮/১০টা করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে। দেশের সব বড় শহরে (কলকাতা ব্যতিক্রম) অ্যাস্ট্রোটার্ফ বসানো হয়ে গেছে। আধুনিক হকির উপযোগী ফিজিকাল ট্রেনিং পাওয়া যাচ্ছে সব সাই সেন্টারে। বিদেশি কোচ, ট্রেনার, ফিজিওদের সংস্পর্শে এসে খেলার টেকনিকে অনেক পরিমার্জনা এসে গেছে খেলোয়াড়দের। তবে সদ্যসমাপ্ত চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সাফল্য এসেছে দেশি কোচের হাত ধরে।

সর্দার সিংহ, রমনদীপ সিংহ, এস ভি সুনীলের মতো আন্তর্জাতিক স্তরে সবচেয়ে পোড় খাওয়া তারকাদের ফিরিয়ে আনাও এই সাফল্যের চাবিকাঠি। যুব খেলোয়াড়দের সঙ্গে এইসব সিনিয়ররা চমৎকার ভাবে সঙ্গত করেছেন গোটা টুর্নামেন্টে। আর কোচ হরেন্দ্র সিংহ ২০১৬ সালে যুব বিশ্বকাপ খেতাব জিতেয়েছেন একদল প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে নিয়ে। তাদের অনেককেই এবার দলভুক্ত করেছেন সিনিয়র ভারতীয় দলে। হরেন্দ্রর কোচিং ও সিনিয়র জুনিয়র সমন্বয়ে সুসংহত ও ভারসাম্যের হকি খেলেছে ভারত। যা দেখে স্বর্ণযুগের ধ্রুপদী ঘরানার ভারতীয় হকির নান্দনিক রূপটাই ফুটে উঠেছে নেদারল্যান্ডের সুরম্য পারিপার্শ্বিকতায়। নভেম্বর ডিসেম্বরে ভারতেই বসছে বিশ্বকাপ হকির আসর। এই বিশ্বকাপেই দীর্ঘদিনের পদক খরা কাটতে চলেছে। ▮

ভালো ইংরেজি বলতে না পারা কোনও অপরাধ নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ টুইটটা অনেকেই দেখেছেন। কুড়ি বছরের কম বয়েসিদের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে হিমা দাস ৪০০ মিটারে সোনা জেতার পর ভারতের অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন টুইট করেছিল, 'ভালো ইংরেজি বলতে না পারলেও, প্রতিযোগিতায় হিমা তার সেরাটা দিয়েছেন।' সত্তর বছর আগে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের একটি জাতীয় ক্রীড়াসংস্থার এহেন ইংরেজিপ্রীতি দুর্ভাগ্যজনক। তাছাড়া, এই মন্তব্য একটি গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা করে। হিমা একজন অ্যাথলিট। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করা উচিত? প্রতিযোগিতায় সেরা পারফরম্যান্স, নাকি ভালো ইংরেজি?

হিমা অবশ্য এসব নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। করার কথাও নয়। অনেক কষ্ট করে

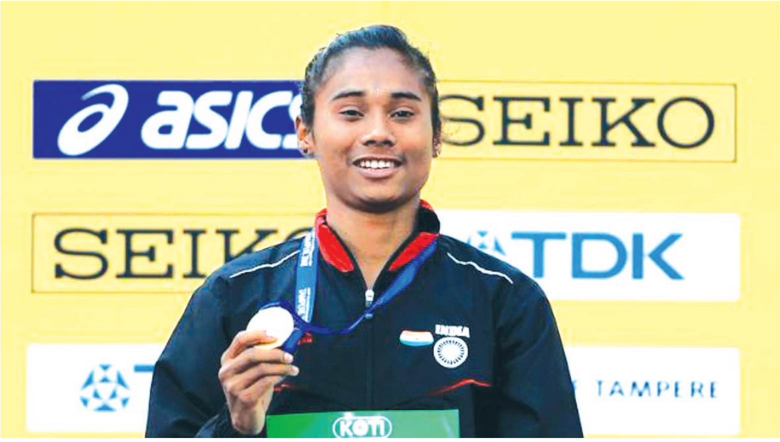

পদক জেতার পর হিমা দাস।

তিনি উঠে এসেছেন। ইতিহাস গড়েছেন। মাত্র আঠারো মাস আগে তিনি অসমের শিবসাগরে একটি আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতা। আর এখন তিনি জুনিয়র বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে ৪০০ মিটার বিভাগে নতুন চ্যাম্পিয়ন। এত অল্পসময়ে এই স্বপ্নের উড়ান অবিশ্বাস্য। কিন্তু তার প্রতিভা, অমানুষিক পরিশ্রম এবং হার-না-মানা মনোভাবের ফলে সমগ্র বিশ্ব আজ অবনত।

হিমার জন্ম নগাঁও জেলার ধিং গ্রামে। বাবা কৃষক। অভাব নিত্যসঙ্গী। এর মধ্যে তাঁর স্বপ্ন দেখা। এই সেদিনও বাবাকে চাষের কাজে সাহায্য করেছেন। গত বছর থেকে তাঁর অ্যাথলোটিক্সকে গুরুত্ব নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু। কারণ পাঁচ ভাই-বোনের কনিষ্ঠতম হিমার কাছে অ্যাথলেটিক্স কোনওদিনই খুব সিরিয়াস বিষয় ছিল না। বাবার কাছে পর্যাপ্ত টাকাপয়সা নেই। কোথায় গেলে প্রশিক্ষণ পাওয়া যাবে সেই খবরও কেউ জানতেন না। ধিং গ্রামের মানুষজনের কাছ থেকে এসব বিষয়ে কিছু আশা করে লাভ নেই। তাই হিমার অবসর সময় কাটত ফুটবল খেলে। ২০১৬ সালে স্কুলের পিটি-শিক্ষক তাকে বলেন, দলভিত্তিক খেলা না খেলে হিমার উচিত কোনও ব্যক্তিগত নৈপুণ্য- নির্ভর খেলায় অংশ নেওয়া।

ই এস পি এন চ্যানেলে কিছুদিন আগে একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়েছে, যেখানে এক বিশেষজ্ঞ বারবার হিমার বিনয়ী স্বভাবের কথা বলেন। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। প্রতিযোগিতায় জেতার পর হিমা প্রথমেই বাড়িতে মাকে ফোন করার চেষ্টা করেন। কারণ তখন তিনি প্রতিযোগিতায় জেতার আনন্দ পরিবারের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইছিলেন। মাকে বলতে চাইছিলেন দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে তিনি কতটা গর্বিত। হিমার মায়ের প্রতিক্রিয়াও ছিল বিস্ময়কর। মেয়ের উচ্ছ্বাস একটু কম হবার পর জোনালি দাস বলেন, 'কমনওয়েলথ গেমস? সেটা আবার কী? তোকে কি টিভিতে দেখাবে? যদি দেখায় তা হলে খুব ভালো হবে। আমরা গ্রামের সবাই মিলে দেখব।'

এই সারল্য কোথায় যেন আমাদের মন ছুঁয়ে যায়। সম্ভবত সেই কারণেই অ্যাথেলেটিক্স-কর্তার ইংরেজিপ্রীতির প্রতিবাদে সারা দেশ গর্জে উঠেছে। ক্ষোভের সঙ্গত কারণও রয়েছে। ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে যারা শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত তাদের মধ্যে অনেকেই অনর্গল ইংরেজি বলতে পারতেন না। উদাহরণ মিলখা সিংহ, কপিলদেব, পি টি ঊষা। এদের অপারগতা নিয়েও অনেক ঠাট্টা তামাশা হয়েছে। নির্লজ্জ মশকরায় তুফান উঠেছে কফির কাপে। ঊষার মুখশ্রী নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও ওরা পিছপা হননি। এক স্বানামধন্য লেখক মন্তব্য করেছিলেন, ঊষাকে যেহেতু দেখতে খারাপ তাই ট্র্যাকে নামার আগে ওর একটু মেক-আপ করে নেওয়া উচিত।

ওরা সেদিনও ছিলেন, আজও আছেন। যতদিন না ইউরোপ সম্বন্ধে শিক্ষিত এবং মূলত শহুরে ভারতবাসীর মোহভঙ্গ ঘটছে ততদিন ওরা থেকেও যাবেন। তাই হিমার উচিত মন খারাপ না করা। অবশ্য তিনি তা করেনওনি। তাঁর কোচ নিপন দাস বলেন, 'হিমা কোনও কিছুতেই ভেঙে পড়ে না। আবার প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক, তাকে মাথায় চড়তে দেয় না। প্রতিটি রেসে তার লক্ষ্য সেরা সময় করা। সেই লক্ষ্যেই হিমা এগিয়ে যাবে।' ■

বাংলাদেশি হিন্দু না মুসলমান কাদের আগ্রাসনে অসমিয়া ভাষার সংকট ?

ধর্মানন্দ দেব

সম্প্রতি অসমিয়া সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম একতরফা ভাবে বলে যাচ্ছে হিন্দু বাংলাদেশির আগ্রাসনে অসমিয়া ভাষা বিলুপ্তির পথে। অসমিয়া ভাষা গভীর সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। অসমিয়া বিপন্ন। ২০০৯ সালে অসম পাবলিক ওয়ার্কস নামে একটি সংগঠন সমগ্র রাজ্যের ভোটার তালিকায় ৪১ লক্ষ বাংলাদেশির নাম রয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করে। ওই মামলার নম্বর ২৭৪/২০০৯। ওই মামলার বলেই সমগ্র রাজ্যে বর্তমানে ১৯৫১ সালের রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী নবায়নের কাজ প্রথমবারের মতো চলছে। তাও আবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে এবং তত্ত্বাবধানে। কোনও কোনও মহল থেকে আবার বলা হচ্ছে ১৯৭১ সনের পরবর্তী সময়ে অসমে ২০ থেকে ৪০ লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অসমের প্রাক্তন রাজ্যপাল এস.কে. সিনহার এক রিপোর্টে এবং লোকসভার তথ্যে বলা হয়েছে অসমে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ৭৫ লক্ষ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই অনুমান নির্ভর সংখ্যার লোক কি সবাই হিন্দু ধর্মীয় না মুসলিম সম্প্রদায়ের। আর যদি উভয় সম্প্রদায়ের হয় তবে কোন সম্প্রদায়ের কত লোক হবে তার কী কোনো বিশ্লেষণ হয়েছে। ১৯৩১ সালে সেন্সাস কমিশনার সি.এস. মুল্লান মুসলমান অনুপ্রবেশকারীকে অসমের জন্য 'serious threat' হিসেবে বলেছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, '...the whole structure of Assamese culture and civilisation has been threatened by the invasion of a vast horde of land hungry Bengali immigrants --mostly Muslims...' সেই একই বক্তব্য দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ উল্লেখ করেছেন নিজের লেখা বই 'India Divided'-এ। এখন এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা অতি সম্প্রতি ২০১১ সালের জনগণনার ভাষা ভিত্তিক তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমে উল্লেখ করা ভালো যে এই তথ্য মতে সমগ্র ভারতবর্ষে বাংলা ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা দ্বিতীয় স্থানে। আর অসমিয়াভাষী লোকের সংখ্যা দ্বাদশ স্থানে। প্রথম স্থানে রয়েছে হিন্দি ভাষায় কথা বলার লোক। সমগ্র পৃথিবীতে মোট বাংলা ভাষার লোকের সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি। পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান ৯ নম্বর।

সারণী-১।। (জনসংখ্যা শতাংশে)		
সাল	হিন্দু	মুসলমান
১৯৫১-৬১	৩৩.৭১	৩৮.৩৫
১৯৬-৭১	৩৭.১৭	৩০.৯৯
১৯৭১-৯১	৪১.৮৯	৭৭.৪২
১৯৯১-২০০১	১৪.৯	২৯.৫৯
২০০১-২০১১	১০.৯	২৯.৫৯

২০১১ সালের জনগণনার ভাষা ভিত্তিক তথ্য মতে অসম রাজ্যে অসমিয়া ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা হচ্ছে ৪৮.৩৮ শতাংশ এবং রাজ্যে বাংলাভাষী লোকের সংখ্যা হচ্ছে ২৮.৯২ শতাংশ। তাই অসমিয়াভাষী এখনো রাজ্যে সংখ্যাগুরু। উল্লেখ্য, বাংলাভাষী লোকের মধ্যে রয়েছে হিন্দু ও মুসলমান। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত অসমিয়াভাষীর সংখ্যা অল্প হলেও কমেছে। কেননা ২০০১ সালে অসমে অসমিয়াভাষীর সংখ্যা ছিল ৪৮.৮০ শতাংশ আর এক দশক পরে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৪৮.৩৮। অর্থাৎ এক শতাংশের অর্ধেকের কম অসমিয়াভাষী লোকের সংখ্যা কমেছে। আরও পরিষ্কার করে বললে বলতে হবে, ২০১১ সালের জনগণনার ভাষা ভিত্তিক তথ্য মতে প্রতি ১০ হাজার লোকের মধ্যে ৪,৮৩৮ জন অসমিয়াভাষী এবং মাত্র ২,৮৯২ জন বাংলাভাষী। ২০১১ সালের জনগণনার ভাষা ভিত্তিক তথ্য মতে অসমিয়াভাষী লোকের সংখ্যা ১,৫০, ৯৫৭৯৭। তার মধ্যে পুরুষ ৭৬,৭৪,৫৫৭ জন। মহিলার সংখ্যা ৭৪,২১,২৪০ জন। বাংলাভাষী লোকের সংখ্যা ৯০,২৪,৩২৪। আর তার মধ্যে পুরুষ ৪৬,১৫,১৮৫ জন। মহিলার সংখ্যা ৪৪,০৯,১৩৯। আর এটা

নিয়েই অসমিয়াভাষীর একাংশ গেলে গেল রব তুলছেন। কিন্তু তারা আসল সত্য উদঘাটন না করে সমস্ত বাঙালি সমাজকে দোষারোপ করছেন। ঢাকঢোল পিটিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন বাংলাদেশি লোকে ভরে গেছে অসম। তারা খতিয়ে দেখতে চাইছেন না যে, আসলে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা অসমে বাড়ছে এবং কারা অসমিয়া সমাজের কাছে হুমকিস্বরূপ। তা উগ্র অসমিয়া জাতীয়তাবাদীদের মাথায় মোটেই ঢুকছে না। ১৯৪৮ সালে অসমের কংগ্রেস সরকার অসমিয়াভাষার লোকের সংখ্যা বর্ধিত করার জন্য এক ভূমিনীতি বলবৎ করে। এই নীতির অধীনে ১৯৫১ সালের জনগণনায় যে ব্যক্তি মাতৃভাষা অসমিয়াকে হিসাবে পরিচিতি দেবে সেইসব লোককেই মাটির পাট্টা দেওয়া হবে। আর মুসলিম লিগ কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়ার পর মুসলিম লিগের নেতারা কৌশলে অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মুসলমান সমাজে নিজেদের মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে অসমীয় লেখার জন্য এক গোপন প্রচার আরম্ভ করে। যার ফলে সেই সময় অসমিয়াভাষী লোকের সংখ্যা বেড়ে যায়। ১৯৩১ সালে অসমে অসমিয়াভাষী লোকের সংখ্যা ছিল ৩১.৪২ শতাংশ এবং সেই সংখ্যা ১৯৫১ সালে একলাফে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৬.৬৯ শতাংশ। জনগণনার তথ্য অনুসারে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে অসমে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৩৩.৭১ শতাংশ এবং তার বিপরীতে মুসসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩৮.৩৫ শতাংশ। আবার ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে অসমে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৩৭.১৭ শতাংশ এবং তার বিপরীতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩০.৯৯ শতাংশ। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে অসমে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়ায় ১০.৯ শতাংশ এবং মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হয় ২৯.৫৯ শতাংশ। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের পরে সমগ্র অসম রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যার হার অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকে। কারণ অসম রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর আগ্রাসন তখন থেকে বাড়তে থাকে। আর কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার এবং আসু মিলে ১৯৭১ সালের আগে আসা মানুষের নাগরিকত্ব পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় অসম চুক্তি নামক এক চুক্তি দিল্লির কোনও এক বিলাসবহুল হোটেলে স্বাক্ষর করে। আর ১৯৭১ সালের পরে সামান্য সংখ্যক হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পার্সি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে এসে বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া ছিন্নমূল নাগরিকদের দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য ২০১৬ সালে বর্তমান কেন্দ্র সরকার ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনকে সংশোধন করে এক সংশোধনী বিল সংসদে উত্থাপন করে। আর একাংশ অসমিয়াভাষী লোক ভবিষ্যতের অশনি সংকেতের কথা চিন্তা না করে গেল গেল রব তুলে বেড়াচ্ছেন। বিলের বিরোধিতার বার্তা নিয়ে হিন্দু বাঙালিদের সমাজে হেয় প্রতিপন্ন স্থাপনের জন্য রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ওরা যে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছেন সেটা ওদের বোধগম্য হচ্ছে না। ওরা শুধু দিবাস্বপ্ন দেখছেন 'অসম শুধু অসমীয়দের জন্য'। এটা এক অবাস্তব এবং এক অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কী! *(সারণী-১ দ্রষ্টব্য)*

অন্যদিকে সমগ্র ভারতবর্ষে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২১.৫৪ শতাংশ এবং ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দশ বছরে জনসংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৭.৬৪ শতাংশ। আবার ওই ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দশ বছরে সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৯.৫ শতাংশ এবং ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দশ বছরে এই মুসলমান জনসংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২৪.৬ শতাংশ। কিন্তু অসমে মুসলমান জনসংখ্যা ওই সময়ে বাড়ে। *(সারণী-২ দ্রষ্টব্য)*

আর একদিকে মুসলমান জনসংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাভাষী লোকের সংখ্যা সামান্য বাড়ে। তার আরো প্রমাণ হচ্ছে মুসলমান জনসংখ্যা অসম রাজ্যে যে সব জেলায় বেড়েছে সেইসব জেলায় বাংলাভাষী লোকের সংখ্যা বেড়েছে। *(সারণী-৩ দ্রষ্টব্য)*

আমরা যদি বরাক উপত্যকার তিন জেলার দিকে তাকাই তখন আসল চিত্র ফুটে উঠবে। একদিকে মুসলমান জনসংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হিন্দুর জনসংখ্যা ক্রমশ কমছে। তার অর্থই হচ্ছে বাংলাভাষী

সারণী-২

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

বিষয়	১৯৯১-২০০১	২০০১-১১
ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	২১.৫৪%	১৭.৬৪%
ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	২৯.৫%	২৪.৬%
অসমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১৮.৮%	১৬.৯%
অসমে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	২৯.৩০%	২৯.৫৯%
অসমে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১৪.৯%	১০.৯%

সারণী-৩

ভাষা ভিত্তিক জনগণনার পরিবর্তন

ভাষা	১৯৯১	২০০১	২০১১
অসমিয়াভাষী	৫৭.৮১%	৪৮.৮১%	৪৮.৩৮%
বাংলাভাষী	২১.৬৭%	২৭.৫৫%	২৮.৯২%

মুসলমান লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলির অবস্থা আরও করুণ। *(সারণী-৪ দ্রষ্টব্য)*

বরাকের তিনটি জেলা ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য বেশ কয়েকটি জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে এবং সেইসব জেলায় বাংলাভাষী লোকের সংখ্যাও বেড়েছে এবং হিন্দুর জনসংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে অসমিয়াভাষী লোকের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। আমরা যদি উপরোক্ত জনগণনার রিপোর্ট এবং ভাষা ভিত্তিক জনগণনার রিপোর্ট নিয়ে এক তুলনামূলক বিশ্লেষণ করি তবে নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হবে যে বিগত দুই-তিন দশক থেকে অসমে বৃহৎসংখ্যক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ঘটছে। তাই অসমিয়া ভাষা বিপন্ন হওয়ার পিছনে অন্যান্য কারণের সঙ্গে এই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ভারতের অসমে আগত অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশকারী দায়ী। তাই আজ অসমে অসমিয়াকে রক্ষাকবচ প্রদান করার প্রশ্ন উঠছে। অন্যদিকে কিন্তু বিহারে বিহারি, পঞ্জাবে পঞ্জাবি, তামিলনাড়ুতে তামিলকে রক্ষাকবচের প্রশ্ন উত্থাপন হচ্ছে না। কেন? কারণ, অসমে জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা। তাই এর হাত থেকে বাঁচতে হলে মুখে শুধু বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা না বলে অসমের সমস্ত 'হিন্দু' ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেওয়া হোক। নতুবা যেভাবে ১৯৪৭ সালে অখণ্ড ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ কোটি, মুসলমান জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৯ কোটি এবং অন্যান্য ধর্মালম্বীর জনসংখ্যা ছিল দেড় কোটি। আর এই মাত্র ৯ কোটি মুসলমান দাবি করে এক স্বতন্ত্র দেশ পাকিস্তান পেয়েছিল তখন। অর্থাৎ দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে দেশ প্রথমে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। আরেকটি অপ্রিয় সত্য কথা হচ্ছে ভাষার ভিত্তিতে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়--- তামিল, তেলুগু, মারাঠি, বিহারি, বাঙালি ইত্যাদি পরিচয় জানতে চাইলে হিন্দু প্রথমে বলবে বাঙালি, মারাঠী ইত্যাদি। তারপর বলবে হিন্দু বা ভারতীয়। কিন্তু মুসলমান, তার বাস পঞ্জাব অথবা কেরল যেখানেই হোক না কেন, নির্দ্বিধায় সে নিজেকে 'মুসলমান' বলে পরিচিতি দেবে। কিন্তু অসমের একাংশ বুদ্ধিজীবী বলেন বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার এবং অপরদিকে একাংশ বলেন অসমিয়াদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। এইসবের আহ্বান কি নিছক ভণ্ডামি নয়? আত্মপ্রবঞ্চনা নয়? অসমের অসমিয়া ও বাঙালির বৃহত্তর স্বার্থে 'হিন্দুদের' ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। এটি দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সেতু বন্ধনের কাজ করতে পারে। আয়নার সামনে দাঁড়ানো উচিত প্রত্যেকেরই। কারণ ভণ্ডামি দিয়ে কোনও মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না। একাংশ উগ্রজাতীয়তাবাদী ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ছুঁতমার্গীরা এই কথার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেতে পারেন। সেটা তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অসুস্থতারই লক্ষণ। এখন সময় হয়েছে সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলার। তথাকথিত সেকুলার সাজার ভড়ং নয়, কোদালকে এখন কোদাল বলতে হবে— 'নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।'

(লেখক পেশায় আনইজীবী)

'ভণ্ডামি দিয়ে কোনও মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না। একাংশ উগ্রজাতীয়তাবাদী ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ছুঁতমার্গীরা এই কথার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেতে পারেন। সেটা তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অসুস্থতারই লক্ষণ। এখন সময় হয়েছে সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলার। তথাকথিত সেকুলার সাজার ভড়ং নয়, কোদালকে এখন কোদাল বলতে হবে— 'নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।''

সারণী-৪

বরাকের চিত্র : বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন জেলা

জেলা	সাল	হিন্দু	মুসলমান
করিমগঞ্জ	১৯৭১	৫৫.১%	৪৪.২%
	১৯৯১	৫০.১%	৪৯.২%
	২০০১	৪৬.৭%	৫২.৩%
	২০১১	৪২.৪৮%	৫৬.৩৬%
হাইলাকান্দি	১৯৭১	৪৭.৫%	৫১.৪%
	১৯৯১	৪৩.৭%	৫৪.৮%
	২০০১	৪১.১%	৫৭.৬%
	২০১১	৩৮.১০%	৬০.৩১%
কাছাড়	১৯৭১	৬৫.৪%	৩২.৫%
	১৯৯১	৬৩.৪%	৩৪.৫%
	২০০১	৬১.৪%	৩৬.১%
	২০১১	৫৯.৮৩%	৩৭.৭১%

সংবাদ প্রতিবেদন

কেঁদে ভাসালেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কর্ণাটকে কংগ্রেস এবং জেডি এসের একত্রে মন্ত্রিসভা গঠনকে বিজেপি-বিরোধী জোটের সাফল্য হিসাবেই তুলে ধরেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী থেকে বিরোধী নেতানেত্রীরা। কংগ্রেস-জে ডি এস মন্ত্রিসভাকে নিয়ে এতটাই উৎসাহী ছিলেন বিরোধী নেতানেত্রীরা যে মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁরা সবাই বিজেপি-বিরোধী এক মহাজোটের বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, বিরোধী নেতানেত্রীরা যতই মহাজোটের কথা বলুন না কেন, কর্ণাটকের এই কংগ্রেস- জেডিএস জোটের মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রথম থেকেই সন্দিগ্ধ ছিল রাজনৈতিক মহল। প্রথম থেকে সংশয় দেখা যাচ্ছিল যে, কংগ্রেসের চাপের কাছে মাথা নুইয়ে জেডিএসের কুমারস্বামী কতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারবেন? কংগ্রেস-জেডিএস সরকার শপথ গ্রহণ করার পর মাস তিনেক কাটতে না কাটতেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, এ সরকার টেঁকবার নয়। আর তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন স্বয়ং কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী।

সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে দলীয় কর্মীদের এক সভায় কেঁদে কেটে একসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী। কাঁদতে কাঁদতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে কুমারস্বামী বলেছেন, 'আমাকে শুভেচ্ছা জানাবেন বলে আপনারা সবাই ফুলের স্তবক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আপনারা সবাই খুশি হয়েছেন যে আপনাদের থাম্মা (ভাই) মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। কিন্তু আমি মোটেই সুখী নই। যে যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে আমি যাচ্ছি, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। এই যন্ত্রণার কথা আমি মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারছি না। জোট সরকারের বিষ আমি ভগবান শিবের মতো কণ্ঠে ধারণ করেছি।' জোট সরকারকে নিয়ে এই ক্ষোভ অবশ্য কুমারস্বামীর নতুন হয়।

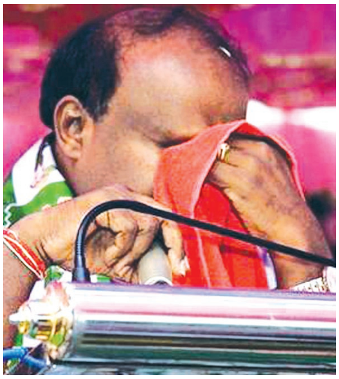

মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার কিছুদিন পরেই কুমারস্বামী বলেছিলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি কংগ্রেসের দয়ায়।' কিন্তু এবার বাঁধ ভেঙে নিজের ক্ষোভ দলীয় কর্মীদের সামনে উজাড় করে দিয়েছেন কুমারস্বামী। বলেছেন, 'ভোটের আগে যেখানেই প্রচারে গিয়েছি লোকে ভিড় করে আমার কথা শুনেছে। কিন্তু ভোট দেওয়ার সময় তারা আমাকে আর আমার দলের প্রার্থীদের ভুলে গিয়েছে। ভগবানের দয়ায় আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি। ভগবানই ঠিক করবেন আমি কতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকব। রাজ্যের মানুষের ভালো করব আর বাবার স্বপ্ন পূরণ করব বলে আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে চেয়েছিলাম। ক্ষমতার লোভে আমি মুখ্যমন্ত্রী হইনি। বিধানসভা ভোটের ফল বুঝিয়ে দিয়েছে রাজ্যের মানুষ আমার ওপর ভরসা রাখেননি।'

জোট সরকার চালাতে গিয়ে কুমারস্বামীর এই ক্ষোভের পিছনে অবশ্য কিছু কারণও রয়েছে। সম্প্রতি কর্ণাটকে বন্যার সময় একটি বাচ্চা ছেলে নিজের এলাকার বানভাসি রাস্তার ছবি পোস্ট করে লিখেছে, এটা দেখেও মুখ্যমন্ত্রীর কোনও হুঁশ নেই। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কর্ণাটক সরকারের ব্যর্থতা নিয়েও বিভিন্ন মহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। সোশাল মিডিয়ায় কুমারস্বামীকে গালমন্দ রোজই বাড়ছে। তদুপরি উপকূলবর্তী অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের ভিতরও এই সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ উত্তরোত্তর বাড়ছে। এইসব বিক্ষোভের মুখে তিনি যে অসহায় তা বোঝাতে গিয়ে কুমারস্বামী বলেছেন, 'ঋণ মকুবের জন্য সরকারি আধিকারিকদের বোঝাতে গত এক মাস ধরে আমাকে কী করতে হয়েছে— তা কেউ জানে না। এখন 'অন্নভাগ্য' প্রকল্পে ৫ কেজি চালের পরিবর্তে ৭ কেজি চাল দেওয়ার দাবি উঠছে। কিন্তু এর জন্য ২৫০০০ কোটি টাকা লাগবে। সে টাকা কোথা থেকে পাব? আবার ঋণ মকুবের জন্য কর বসিয়ে সমালোচিত হচ্ছি। সংবাদমাধ্যম বলছে আমার ঋণমুকুবের পরিকল্পনার ভিতর কোনও স্বচ্ছতা নেই। আমি কিন্তু চাইলে মাত্র দু-ঘণ্টার ভিতরই পদ ছেড়ে দিতে পারি।'

দলীয় কর্মীদের সভায় কান্নাকটি করে কুমারস্বামী যখন এইসব কথা বলেছেন, তখন দলীয় কর্মীরা অবশ্য তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। কিন্তু কুমারস্বামীর এসব কথাবার্তায় সব থেকে অস্বস্তিতে পড়েছে তার জোটসঙ্গী কংগ্রেস। গত ২৩ মে কুমারস্বামী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেও দপ্তর বণ্টন ও বাজেট পেশ নিয়ে ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের সঙ্গে চূড়ান্ত মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে তাঁর। কুমারস্বামীর এইসব কথাবার্তাকে হালকা করে দিতে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা জি পরমেশ্বর বলেছেন, 'উনি অসুখী হবেন কেন? উনি অবশ্যই সুখী। একজন মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বদা সুখী হতে হবে। উনি সুখী হলেই আমরা সবাই সুখী।'

কুমারস্বামীর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপিও। বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেছেন, এ ঘটনার জন্য রাহুল গান্ধী না আবার বিজেপিকে দায়ী করে বসেন। বিজেপির সোশাল মিডিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত অমিত মালব্য বলেছেন, কংগ্রেসের অসম্মান সত্ত্বেও কুমারস্বামী মুখ্যমন্ত্রীর গদি ছাড়তে পারছেন না।

সংবাদ প্রতিবেদন

তৃণমূল সরকারের পতন হবেই : নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের শাসনে পশ্চিমবঙ্গে যে সিন্ডিকেটরাজ চলছে, তাকে এবার কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মা-মাটি-মানুষের সরকার আসলে সিন্ডিকেটের সরকার। সিন্ডিকেট ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে কিছুই করা সম্ভব নয়।' গত ১৬ জুলাই মেদিনীপুর শহরের কলেজ মাঠের জনসভায় এভাবেই কড়া ভাষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগেও প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকবার এই রাজ্যে এসেছেন। সভাও করেছেন বেশ কয়েকটি। কিন্তু এত আক্রমণাত্মক ভাষণ প্রধানমন্ত্রী আগে কখনও দেননি। স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে ডাকা প্রধানমন্ত্রীর এই সভাটিতে জনসমাগম ছিল আকর্ষণীয়। সভাস্থল ছাড়িয়ে ভিড় ছড়িয়ে পড়েছিল বাইরে। ভিড়ের চোটে বহু মানুষ সভাস্থলের ধারে কাছেই ঘেঁষতে পারেননি। স্মরণাতীত কালের মধ্যে মেদিনীপুরে এত বড় সভা হয়নি বলেই বলছেন স্থানীয় মানুষজন। প্রধানমন্ত্রীকে একবার চোখের দেখা দেখতে প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করেও দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছিলেন বহু মানুষ।

প্রধানমন্ত্রী এদিন তাঁর ভাষণে প্রথম থেকেই ছিলেন আক্রমণাত্মক। তৃণমূল কংগ্রেস দল এবং সরকারকে সরাসরি নিশানা করেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মা-মাটি-মানুষের সরকার আসলে সিন্ডিকেটের সরকার। সিন্ডিকেটের নাম করে এখানে গরিব মানুষের অর্থ লুঠ করে নেওয়া হচ্ছে। এখানে যা কিছু করতে হবে, সবই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে। সিন্ডিকেট ছাড়া এখানে কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়। এখানে কোনও নতুন সংস্থা খুলতে গেলে সিন্ডিকেটের দ্বারস্থ হতে হয়। ইট, বালি, সিমেন্ট কিনতে সিন্ডিকেটের কাছে যেতে হয়। এমনকী, এখন কলেজে ভর্তির জন্যও সিন্ডিকেটের কাছে যেতে হচ্ছে। এই সিন্ডিকেটকে ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে শাসক দল। বিরোধীদের খতম করতেও এই সিন্ডিকেটকে কাজে লাগানো হয়েছে। সমস্ত রকম বেআইনি কাজের সঙ্গে এখানে সিন্ডিকেট যুক্ত। সিন্ডিকেটের ইচ্ছা ছাড়া এখানে কিছু হয় না।' প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে যতই আক্রমণাত্মক হয়েছেন, ততই সভায় উপস্থিত জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি দিয়েছে।

বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভোট প্রক্রিয়াকে মান্যতা দেয় না এই রাজ্যের সরকার। এই রাজ্যেই বন্দে মাতরম্ রচিত হয়েছিল। সেই পবিত্র ভূমিতে এখন সিন্ডিকেটের দাপাদাপি। পঞ্চায়েত ভোটে জুলুমবাজি, সন্ত্রাস হয়েছে। বাম আমলের থেকেও খারাপ অবস্থা এখন এই রাজ্যের। তৃণমূল সরকারের আমলে অপশাসন চলছে এখানে। তবু, এত সন্ত্রাসের ভিতরেও বিজেপি কর্মীরা ভোটে লড়েছেন। তাদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।' তিনি বলেন, 'বামেদের সরিয়ে এই বিপদ কি আপনারা আনতে চেয়েছিলেন? বামেদের সরকার থেকে সরাতে অনেক সময় লেগেছিল। কিন্তু এবার অত সময় লাগবে না। সারদা, নারদায় কারা যুক্ত তা রাজ্যবাসী জানেন। দেওয়ালের লিখন পড়ে নিন— অত্যাচারীর বিদায় নিশ্চিত। বাংলায় তৃণমূল সরকারের পতন হবেই। আর সে পতন নিশ্চিত করবে বিজেপি। ২০১৯ থেকেই তৃণমূলের পতন শুরু হয়ে যাবে।'

প্রধানমন্ত্রীর সভামঞ্চে যাওয়ার পথে অসৌজন্য দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া ফ্লেক্স এবং দলীয় পতাকা গায়ের জোরে টাঙিয়ে দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এদিন এ নিয়ে খোঁচাও দেন। বলেন, 'আসার পথে দেখলাম চারদিকে মমতা ব্যানার্জির হাত জোড় করে প্রণাম করার ছবি। এভাবে পতাকা টাঙিয়ে আমাকে যে উনি স্বাগত জানিয়েছেন, তার জন্য ওকে ধন্যবাদ।' প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে আরও বলেন, 'বিজেপির আগে কৃষকদের কথা কেউ ভাবেনি। বিজেপি কৃষকদের কথা ভাবেই বলেই সহায়ক মূল্য বাড়িয়েছে। এতে এই রাজ্যের পাটচাষীরা উপকৃত হবেন।' তিনি বলেন, 'এই রাজ্যে আলুর ফলন ভালো হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত হিমঘর নেই। বন্যায় আলুর ক্ষতি হয়। আলু চাষীদের জন্য কেন্দ্র এবার বিশেষ প্রকল্প নিচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রীর সভায় এদিন ভিড়ের চাপে মণ্ডপের একাংশ ভেঙে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভাষণ থামিয়ে সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নিজের নিরাপত্তারক্ষীদের। সভাস্থলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিকরা সেই সময় কেউই ছিলেন না ঘটনাস্থলে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এস পি জি বাহিনী আহতদের উদ্ধারকার্যে হাত লাগায়। প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্সে করেই আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর কাজ শুরু হয়। পরে সভার শেষে প্রধানমন্ত্রী হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখাও করেন।

কলকাতার আর্চবিশপ তীব্র ভর্ৎসনা করলেন লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ তসলিমা নাসরিন তাঁর টুইটারে প্রয়াত মাদার টেরেসার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় কলকাতার চার্চগুলির প্রধান পাদ্রি ফাদার থমাস ডিসুজা তাঁকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। এই বিষয়ে ডি সুজার সঙ্গী হয়েছেন সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আর এক ফাদার ফেলিক্স রাজও। উভয়েই তসলিমার বক্তব্যের নিন্দা করেছেন।

প্রসঙ্গত, এখানকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর টুইটারে লিখেছেন তাঁর সন্দেহ বিজেপি মাদারের মিশনারিজ অব চ্যারিটির দুর্নাম করার উদ্দেশ্যে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

এর প্রতিক্রিয়ায় নাসরিন সরাসরি লিখেছেন, 'মাদার টেরিসার চ্যারিটি হোম যে নিয়মিত শিশু বিক্রি করে এটা নতুন কিছু নয়। মাদার টেরিসা তাঁর জীবদ্দশায় বহুবিধ বেআইনি, অমানবিক, অনৈতিক, নিয়মবহির্ভূত, নীতিভ্রষ্ট, দুরভিসন্ধিপূর্ণ, জালিয়াতিতে ভরা বর্বরোচিত কাজ অনায়াসে করে গেছেন।' তসলিমা বলেছেন, কেবলমাত্র বিখ্যাত হলেই কোনও অপরাধীকে আড়াল করা যায় না বা কুকর্ম ধামা চাপা দেওয়া যায় না।

এরই প্রতিক্রিয়ায় ফাদার ডি সুজার অভিযোগ, নাসরিন শুধু নির্দয়ভাবেই তাঁর মতামত ব্যক্ত করেননি, তিনি অসত্য কথাও বলেছেন। তাঁর এই ঘোষণায় মানুষের মনে মাদারের যে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত তাতে কোনও হেরফের হবে না। সারা বিশ্বই মাদারের পবিত্র কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। এই ধরনের মন্তব্যে তাতে আঁচড় পড়বে না বলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

অন্যদিকে ফাদার ফেলিক্স রাজ বলেন, "কোনও মানবিকগুণ- সম্পন্ন সুস্থ মন ও হৃদয়ের মানুষের পক্ষে এই ধরনের নিষ্ঠুর অভিযোগ করা অসম্ভব। আমি এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাচ্ছি। কোনও মানুষ যিনি আর বেঁচে নেই কিন্তু সমাজে একটি ছাপ রেখে গেছেন তাঁকে অভিযুক্ত করার সহজ পথ নিয়ে প্রচার পাওয়া অন্যায়। তাছাড়া অভিযোগটিও ভিত্তিহীন।"

শিশু বিক্রয় সম্পর্কে রাজের বক্তব্য, গত দু'বছর হলো মিশনারিজ অব চ্যারিটি থেকে সন্তান হিসেবে পালন করার উদ্দেশ্যে শিশু হস্তান্তর বন্ধ হয়ে গেছে। কেবলমাত্র আদালতের বৈধ কাগজপত্র থাকলে তবেই পালিত সন্তান এখান থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য শিশু বিক্রির অভিযোগ তাঁর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তবু যদি অন্য কোনও প্রদেশের কোনও শাখায় এমন ঘটে থাকে সেক্ষেত্রে স্থানীয় পুলিশের তদন্ত করে দেখা উচিত।

এখানে থেমে না থেকে রাজ বলেন, সমাজে এমন বহু মানুষ আছেন যাঁরা 'মাদার'কে বোঝেন না। শুধুমাত্র হিংসা, আক্রোশ বা কোনও ব্যক্তিগত কারণে তাঁকে আক্রমণ করেন। এখনও অনেকে আছেন কেবলমাত্র তিনি খ্রিস্টান ছিলেন বলেই নানা ভালো কাজ করা সত্ত্বেও তাঁকে তারা পছন্দ করে না।

এই মর্মে মিশনারিজ অব চ্যারিটির তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া না গেলেও মাদারের বিরুদ্ধে যে ধর্মান্তরকরণের পরিচিত অভিযোগ বরাবর শোনা যায় 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার' মতো সেন্ট জেভিয়ার্সের উপাচার্য রাজ তাও ফুৎকারে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তবে সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত জারি আছে।

কলকাতা মেট্রোপলিটন আদালত শমন ধরাল কংগ্রেস নেতা শশী থারুরকে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ শশী থারুরের বিজেপি-র বিরুদ্ধে 'হিন্দু পাকিস্তান' সৃষ্টি করার অভিযোগে আনীত ফৌজদারী মামলায় তাঁকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ পাঠালেন কলকাতা মেট্রোপলিটন আদালতের বিচারপতি। একই সঙ্গে জম্মু কাশ্মীরের সহ-মুফতি নাসির উল ইসলামকেও ভারতের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আলাদা একটা দেশ তৈরির দুরভিসন্ধিপূর্ণ দাবি করায় শমন ধরিয়েছে।

সম্প্রতি থারুর বিজেপি আবার ক্ষমতায় ফিরলে তারা সংবিধান বদল করে দেশকে 'হিন্দু পাকিস্তান'-এ পরিবর্তন করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এমন মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট বিজেপি ও সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলি। কংগ্রেস এই মন্তব্য থেকে 'না ছুঁই পানি' অবস্থান নিয়েছে। একই সঙ্গে থারুরের বক্তব্য, রাজ্যসভায় দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা নেই বলেই বিজেপি সংবিধান নতুন করে তৈরি করতে পারছে না। স্থানীয় ব্যবহারজীবী সুমিত চৌধুরী অভিযোগ করেছেন থারুরের বক্তব্যে ভারতীয় ধর্মীয় সংবেদনশীলতায় আঘাত করার পাশাপাশি দেশের সংবিধানেরও অমর্যাদা করা হয়েছে। এরই প্রতিকার চেয়ে কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে মামলাটি রুজু হয়েছে। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৩এ ও National Honour Act ১৯৭১-এর ২নং ধারায় বিচারের জন্য মামলাটি গৃহীত হয়েছে। অন্যদিকে জম্মু-কাশ্মীরের মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সহ-সভাপতি নাসির ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন শরদকুমার সিংহ। বিচারক মনোদীপ দাশগুপ্তের আদালতে মামলাটি গৃহীত হওয়ার পর বিচারক ১৪.৮.১৮-তে আদালতে কুচক্রী মোল্লাটিকে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন।

আমার দেখা স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দ পোদ্দার

মুরলীধর সরকার

সালটা ১৯৮৫, আমি তখন মালদা ললিত মোহন শ্যামমোহিনী বিদ্যালয়ে পড়ি। অরবিন্দ ছাত্রাবাসে থাকি। মে মাসের মাঝামাঝি একদিন হঠাৎ বিভাগ প্রচারক গোবিন্দদা অরবিন্দ প্রভাত শাখায় এলেন। শাখা শেষে বৈঠক নিলেন। বিষয় রাখলেন প্রথম কে কে যাবে। প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই এই কাঁঠাল প্রিয় মানুষটি, পিরিতের আঠা লাগিয়ে আমাদের চিটে গুড়ে পিঁপড়ে পড়ার হাল করে দিলেন। আলস্যপ্রিয় তিন ছাত্র সত্যেন সাহা, অসীম সরকার এবং অখিল দাস আগেই রাজি হয়ে গেল। আমি থমকে গেলাম আর্থিক কারণে। আমার পূর্ণ গণবেশও ছিল না। তাছাড়া আমার সেজদা শিবিরে যাওয়ার জন্য, আগেই বাড়ির অনুমতি আদায় করে নিয়েছিল। ফলে উপায়নং নাস্তি।

গোবিন্দদা বললেন, 'তুমি মুখ্যশিক্ষক, তোমাকে যেতেই হবে। টাকার কোনও সমস্যা হবে না।' শুনে মন আনন্দে নেচে উঠল। ভাবলাম আমার শুল্ক, আমার গণবেশ স্বয়ং গোবিন্দদা। সেইদিন থেকে আমার দিন গোনা শুরু। কবে আসবে সেই দিন। দিন কয়েক পরে নিবাসে আমার ডাক পড়ল। গেলাম। গোবিন্দদা বললেন, 'তুমি কবে শুল্ক জমা দেবে।' কথাটা শুনেই যেন মাথায় বজ্রাঘাত হলো। কোনও রকমে বললাম, 'আমি যাব না'। আমার ভাব বুঝে তিনি বললেন, 'দেশমাতৃকার কাছে অর্থ কোনও অন্তরায় নয়। আগে মন স্থির করো তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' সেই রাতেই ছুটে গেলাম অধীরদার (অধীর চন্দ্র কর্মকার) কাছে। বিষয়টা বলে টাকা ধার চাইলাম। উনি খুশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় অর্থ দিলেন এবং তাঁর নিজের জুতো-মোজা দিলেন ট্রেনিংয়ে যাবার জন্যে। তার কয়েকদিন পরে মহানন্দে আমি অখিলদা অসীমদা রওনা হলাম প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে, কলিগ্রামে।

একই ভাবে তাঁর প্রেরণাতেই মালদাতে দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ করি ১৯৯০ সালে। সেই সময় চর্চাপর্বে পেয়েছিলাম রামমন্দির আন্দোলনে শহিদ হয়ে যাওয়া রামকুমার কোঠারীকে। এটা আমার পরম ভাগ্য। আজ গোবিন্দদা নেই। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। ব্যথিত মন বলছে 'বহুকালের সেই পরিচিত গাছ/ হঠাৎ-ই গেল শুকিয়ে/ হাতের মুঠোয় ফুল নিয়েও/ আজও গন্ধ পাই তার। —তাঁর এই সুবাস স্বয়ংসেবকদের কাছে রবে অনন্তকাল ধরে।

আমাদের অঞ্চলে শাখা বিস্তারের প্রয়াসে গোবিন্দদার অনবদ্য ভূমিকার কথা সবার মনে থাকবে। তিনি অন্যান্য কার্যকর্তা এবং প্রচারকদের সহযোগিতায় কীভাবে প্রতিকুল পরিবেশে শাখা দাঁড় করিয়েছিলেন তা মনে করলে আজও অবাক হয়ে যাই।

আমাদের গ্রাম ও আশেপাশের অঞ্চলে তখন (১৯৮২ সনে) লাল সন্ত্রাস চলছে। সন্ত্রাসের নায়ক ছিল আমাদের গ্রামেই। পান থেকে চুন খসলেই সরল গ্রাম্য মানুষদের ভিটে ছাড়ার ভয় দেখিয়ে সে মোটা অঙ্কের সেলামি আদায় করত। থানা প্রশাসন ছিল তার হাতের মুঠোয়। রাতের অন্ধকারে যুবকদের মদ এবং মাংসের লোভ দেখিয়ে এবং প্রয়োজনে ভয় দেখিয়ে খাড়ির ধারে সরকারি ফরেস্ট থেকে বড় বড় গাছ কেটে পাচার করত। প্রাণভয়ে কেউ কিছু বলত না। এমতাবস্থায় গ্রামে শাখা শুরু হলো। দু' বছর গড়াতে না গড়াতে তার কোপ পড়ল শাখায়। প্রথমে সে হার্মাদ বাহিনী দিয়ে অভাবী স্বয়ংসেবকদের (অশ্বিনী, বাবুলাল, কিশোরী মণ্ডল এবং ক্ষিতিশ চন্দ্র সরকার) পাট্টা এবং রেকর্ডভুক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি কেড়ে নিল। অভিভাবকরা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেও বিফল হলো। ফলে শাখা বন্ধ হয়ে গেল। সেই বছরেই গাজোলের শিবাজীনগরে সঙ্ঘের বনভোজনে আমি, মুখ্যশিক্ষক ভূপেশ চন্দ্র সরকার, কার্যবাহ প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার এই তিন জন অংশ গ্রহণ করলাম। বিষয়টি গোবিন্দদাকে জানালাম। তিনি সবকিছু শুনে বললেন, 'প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজীকেও স্বয়ংসেবকরা' অনেক সমস্যার কথা বলতেন। উত্তরে ডাক্তারজী সমাধান হিসেবে শাখা করতে বলতেন। তেমনি তোমরা এখন বড়দের আশা না করে বালকদের নিয়ে শাখা শুরু করো। তাদের এই বার্তা দাও, ''তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'', তাহলেই তোমরা তোমাদের জমিজমা এবং গ্রামে শান্তি ফিরে পাবে।' নরসিংহদাকে অনুরোধ করলেন এই ব্যাপারে আইনগত পরামর্শ বিনয়দার (উকিল বিনয়ভূষণ সরকার) কাছে নিতে। আমরা বাড়ি ফিরে মনের জোর নিয়ে আবার শাখা শুরু করলাম। খেলার মাধ্যমে শাখাকে প্রাণবন্ত করে তুললাম। ক্রমে ক্রমে বড়রাও আসতে শুরু করল। পাশের গ্রামের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন যুবকরা শাখা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগল। প্রথমে ইদাস, আহিল পরে সাবইবন, রাধানগর এবং হাটনগরে শাখা শুরু হলো। এই শাখাগুলি গোবিন্দদা নিজে, কখনো প্রচারক এবং কার্যকর্তাদের দিয়ে প্রচণ্ড সক্রিয় করে তুলেছিলেন। ফলে এই সাতটি শাখার মিলিত প্রয়াসে ১৯৮৮ সালে কেড়ে নেওয়া স্বয়ংসেবকদের জমিজমা এবং গ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে আমরা সক্ষম হই। এখনও তা আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন আমরা শাখাশূন্য স্বয়ংসেবক হয়ে গেছি। কেবল পরিচয়ে সঞ্জায় বাড়াচ্ছি। আমাদের অঞ্চলে এখন একমাত্র আহিলে নিত্য শাখা চলে। আটটি চলা শাখা শুধু বন্ধের মধ্যে থাকে। তবে সঙ্ঘের সঙ্গেই যুক্ত আছে। আগামীদিনে সব শাখা যদি সচল করতে পারি তবেই প্রয়াত গোবিন্দদার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ সার্থক হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

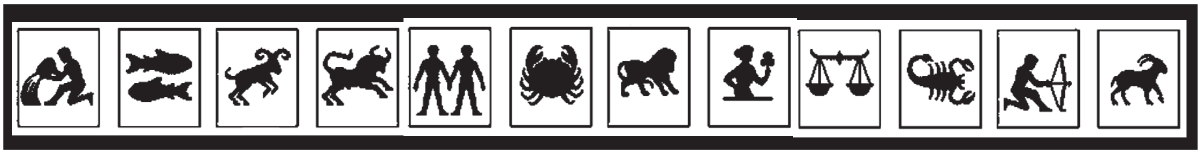

২৩ জুলাই (সোমবার) থেকে ২৯ জুলাই (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রবি-বুধ-রাহু। সিংহে শুক্র তুলায় বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে মঙ্গল-কেতু। শুক্রবার রাত্রি ১টায় বুধ বক্রী হচ্ছে। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃশ্চিকে অনুরাধা থেকে মকরে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে।

মেষ : আত্মীয়-কুটুম্ব সমাবেশে গৃহে বিবাহ ইত্যাদি শুভ অনুষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশ। ভ্রাতা-ভগ্নি ও সন্তানের বিদ্যা ও কর্মে প্রগতি ও আর্থিক শুভ। সপ্তাহের শেষভাগে শারীরিক অসুস্থতা ও পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝি। শৌখিন ও বিলাস সামগ্রীর ব্যবসা শুভ।

বৃষ : সজীব ও সাবলীল ভাবে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় অনায়াস সাফল্য। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আশীর্বাদ লাভ। উদ্যমী মনোভাব নতুন ব্যবসায় ক্রমবর্ধন স্বাচ্ছন্দ্যগতি বিস্তার লাভ। মান-সম্মানের ক্ষেত্রকে শুভ বলা যায় না।

মিথুন : বেকারত্বের অবসানে সুন্দর ও বর্ণময় জীবনের সূচনা। সাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সমাজকল্যাণমূলক সৃষ্টিশীল কর্মে ভরপুর মন। মঠাধীশ-সংস্কৃতিমনস্ক বিদগ্ধ ব্যক্তিদের শাস্ত্রীয় জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে যশ ও বৈরাগ্য। সপ্তাহের শেষভাগে ছলনাময়ীর দোলাচলে মানসিক বিভ্রান্তি ও সময়ের অপচয়।

কর্কট : বিদ্যার্থী, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিকের চিন্তার বাস্তবায়ন ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ। প্রতিবেশী ও সন্তানের বিশেষ গুণে মূল্যবোধের পরিসর বৃদ্ধি। বাহন ও সম্পত্তি ক্রয়ের সম্ভাবনা। গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি অটুট থাকবে।

সিংহ : নিজ বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতায় জীবনের ঝরাপাতায় বসন্তের নব পত্রাগম। ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধান ও বকেয়া পাওনার প্রাপ্তিযোগ। লাইফ পার্টনারের অর্থে সংস্থানের শুভ ইঙ্গিত। খনিজ ও যানবাহন ব্যবসায় প্রসার। সন্তানের বিদ্যার্জনে সাফল্যে আনন্দ।

কন্যা : গুরুজনে শ্রদ্ধাভক্তি পারিবারিক সুস্থিতি ও সমাজ প্রগতিমূলক কর্মে নতুন সুহৃদের সন্ধান। অভিজাত ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। সুখী পারিবারিক জীবন। বিত্ত ও অভিজাত গৌরব বজায় থাকবে। শেয়ার, প্রমোটার, বক্সার, ব্রোকারদের শুভ সময়।

তুলা : গ্রহরত্ন, গহনা, বস্ত্র ও কসমেটিক্স ব্যবসার ক্ষেত্রে অনুকুল সপ্তাহ। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা। ভ্রাতা-ভগ্নির কর্মসংক্রান্ত শুভ সংবাদ প্রাপ্তিযোগ্য, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সান্নিধ্যে দয়ার্দ্র হৃদয়ের প্রকাশ। স্ত্রী অর্থ ও ভাগোন্নতির সহায়ক।

বৃশ্চিক : কবি, শিল্পী, সাহিতিকের নতুন সৃজনী শক্তির উন্মেষ, যশ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। প্রিয়জনের সঙ্গে সন্তানের কর্মপন্থা বিষয়ক সফল আলোচনা। মূল্যবান অলংকার ও বিলাসদ্রব্য ক্রয়। বদহজম ও রক্তচাপ বৃদ্ধিজনিত অস্বস্তি দেখা দেবে। সংযমীভাব এগিয়ে চলার পাথেয়।

ধনু : গৃহ ও মাতৃসুখ। সুহৃদের প্রভাবে উচ্চশিক্ষায় আলোকোজ্জ্বল দিশার সন্ধান। দুর্বল শ্রেণীর প্রতি মমত্ববোধে অগ্রণী ভূমিকা। জনসংযোগ বিভাগ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাইফ পার্টনারের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। একাধিক উপায়ে অর্থাগম। শিরঃ ও বক্ষপীড়ার সম্ভাবনা।

মকর : চিন্তা-ভাবনায় দোদুল্যমানতা পরিহার সমীচিন। সম্পত্তি বিবাদের প্রশমন, শত্রু হ্রাস ও ঋণমুক্তির ক্ষেত্রে অনুকুল সময়। সন্তানের শিক্ষায় আধুনিকতার পরশ। ফেসবুক-টুইটারে সময়ের অপচয়। উচ্চাভিলাসীর চাতুরীতে সতর্ক ও বাক্‌সংযমী হওয়া দরকার।

কুম্ভ : ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য, মানবিকতা, বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও পার্থিব সুখ। নিজ বুদ্ধিমত্তা ও বাক্‌পটুতায় সরকারি সম্মান প্রাপ্তির সোপানে উন্নতি। বহুবিধ ব্যঞ্জনের সমাহারে বিলাসবহুল ভাবে সুখী জীবন লাভ। শ্বশুরালয়ের দিক থেকে দুঃসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা।

মীন : অধস্তনের ষড়যন্ত্র, রাজরোষ, মূল্যবান সামগ্রীর চুরি, বন্ধু বিচ্ছেদ। সন্তানের ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা ও ইন্টারভিউতে সফলতা। সপ্তাহের শেষভাগে অভাবনীয় ভাবে জীবনের ঘনান্ধকার পরিবেশে উষার উদয়।

• *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

শ্রী আচার্য্য